মানবতন্ত্র/ আবুল ফজল

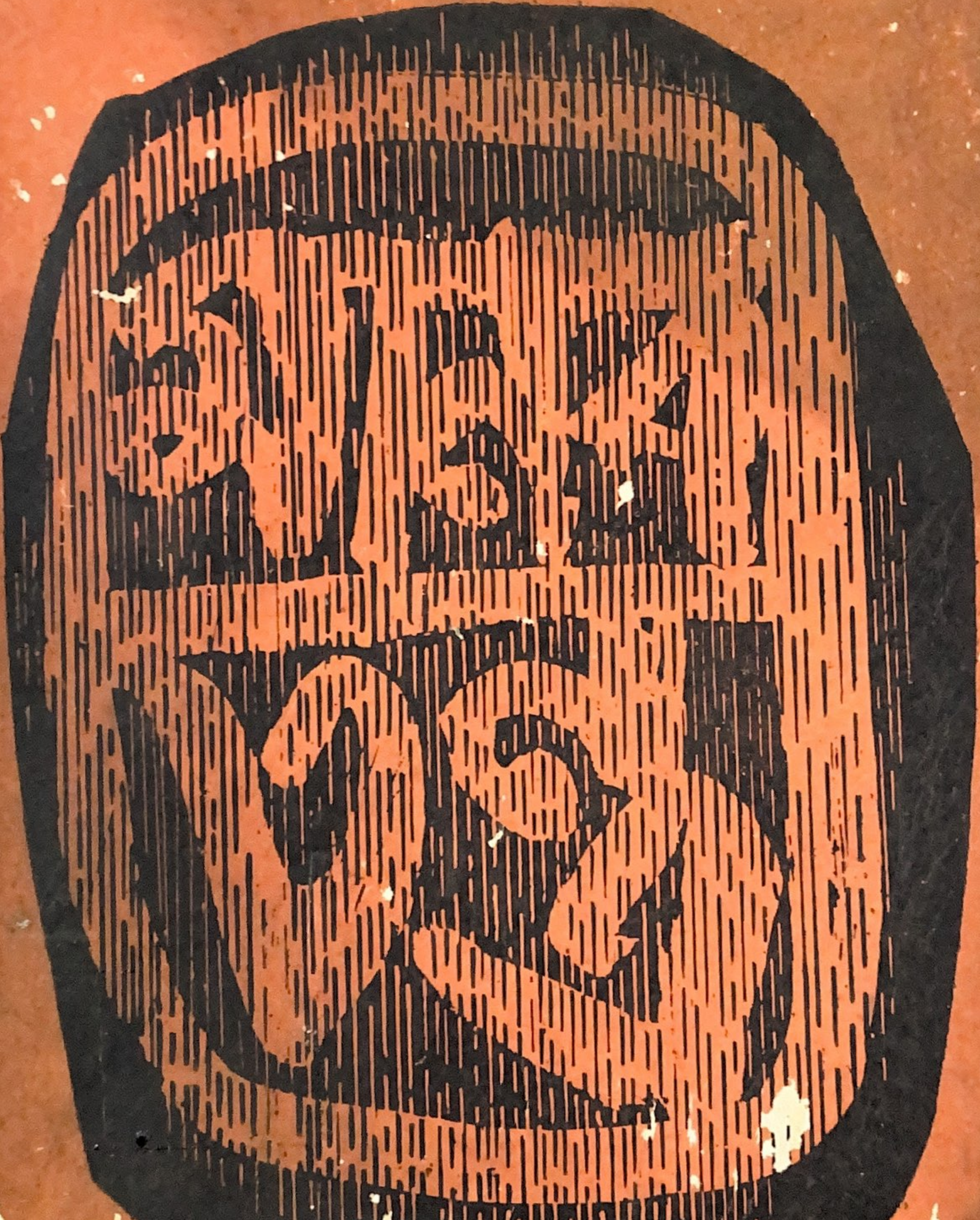

মানবতন্ত্র

আবুল ফজল

মুক্তধারা

২২/২/৮৩

মুক্তধারা ৪৭৭

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ
প্রথম সংস্করণ : মে ১৯৭২
দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ১৯৭৯
প্রচ্ছদ-শিল্পী : সৈয়দ ইকবাল
মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ
মূল্য : পাঁচ টাকা

MANABTANTRA
[A Collection of Essays]
Abul Fazal
Cover design : Syed Iqbal
Second edition : March 1979
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashganj
Dacca—1
Bangladesh.
Price : Taka 5·00

লেখকের মন্তব্য

আমার কয়েকটি লেখার এ ক্ষুদ্র সংকলনটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীসত্যেন সেনের উদ্যোগে। শ্রী সেনের আশা ছিল বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের কথাকে ক্ষুদ্রাকারে সাধারণ পাঠকের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রেখে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে কৌতূহলী পাঠকের মনের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

অপ্রত্যাশিতভাবে দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হয়ে পড়ায় তাঁর সে আশা আর পরিকল্পনা অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত 'মানবতন্ত্রের' প্রথম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং বইটি দীর্ঘকাল থেকে যায় দুষ্প্রাপ্য।

বুদ্ধি ও বিচারে বিশ্বাসী এবং তাতে কৌতূহলী পাঠকের সংখ্যা আমার বিশ্বাস, দিন দিনই বেড়ে চলেছে। যে যুগে ও কালে আমরা বাস করছি এ-না হয়ে পারে না। কারণ মানুষ জন্মমুহূর্ত থেকেই কৌতূহলী। সে জানতে এবং পরখ করে দেখতে চায় সব কিছু। অনেক সময় প্রতিকূল পরিবেশ তার জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধি ও যুক্তি বিচার এ পাঁচিল ডিঙাবার প্রধান হাতিয়ার। লেখক আর শিল্পীদের অন্যতম দায়িত্ব এ হাতিয়ার গাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া। লেখক হিসেবে আমার সীমিত শক্তি নিয়ে আমি এ দায়িত্বটুকু পালন করার চেষ্টা করে থাকি।

এ বই-এর অন্তর্গত লেখাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য পাঠকদের জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলা। সে পথে একটুখানি সহায়তা করা।

আমার যুক্তি বিচারই যে চরম ও শেষ তেমন কোন অসম্ভব দাবী আমার নেই। কোন লেখাই চিরন্তন নয়। কাল যেমন গতিশীল, তেমনি মনও গতিশীল। এ স্রেফ আমার এক বিনীত নিবেদন।

'মুক্তধারা'র শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা এগিয়ে না এলে এর দ্বিতীয় সংস্করণ যে কবে পাঠকদের সামনে পেশ করা যেতো, দেশ ও প্রকাশনা শিল্পের এ দুঃসময়ে তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। আমি আর আমার পাঠকেরা শ্রী সাহার কাছে কৃতজ্ঞ।

সাহিত্য নিকেতন
১২.১২.৭৮

আবুল ফজল

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার পাঁচটি লেখা নিয়ে এ সংকলনটি প্রকাশিত হলো। প্রথম চারটি লেখা ইতিপূর্বে আমার অন্য বইতেও ছাপা হয়েছে। শেষের লেখাটি এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, এমন কি কোন সাময়িক কাগজেও না। যদিও লেখাটির রচনাকাল বেশ কয়েক বছর আগে।

বাংলাদেশ যখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল লেখাটি তখন একাধিক কাগজে পাঠিয়ে দেখেছি, কেউ ছাপতে রাজি হয়নি। হঠাৎ দেশে এমন এক ওলটপালট ঘটে গেল যে যার ফলে রাষ্ট্রীয় আদর্শ আর ধ্যান ধারণায় অবিশ্বাস্যরূপে একটা পট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যার সঙ্গে আমাদের নিজেদের ধ্যান-ধারণার রয়েছে মিল। আমরা যারা লিখে থাকি তারাও যেন এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। হয়তো মনের কথা মনের মতো করে বলা যাবে এখন থেকে।

তবে এও সাময়িক কিনা তা বুঝতে সময় লাগবে।

লেখকের একটা দায়িত্ব পাঠকের মনে কিছু জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলা। আমার বারে বারে প্রত্যাখ্যাত লেখাটির ও এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। সব কিছু থেকে মানুষ মোহ-মুক্ত হোক। বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বিচার করে দেখুক, সর্ব ব্যাপারে মানুষ যুক্তিশীল তথা র‍্যাশেনাল হোক, লেখক সর্বান্তকরণে এ লেখাগুলির মারফৎ সে কথাটাই বলতে চেষ্টা করেছে। এ বইটি প্রকাশের জন্য আমি শ্রীসত্যেন সেনের কাছে ঋণী।

আবুল ফজল

সূচী

মানবতন্ত্র ৯
ধর্ম ও রাষ্ট্র ২২
সভ্যতার সংকট ৩৬
সংস্কৃতি ৪০
আগামী দিনের সভ্যতা : একটি কল্পনা ৪৭
মানব-কল্যাণ ৬০

মানবতন্ত্র

জাতীয় আদর্শের ধারণা সকলের এক নয়। সাহিত্যিকের কাছে সত্যই বড় কথা। সত্যের সঙ্গে যদি জাতীয় আদর্শ, ধর্ম বা শাস্ত্রের বিরোধ ঘটে নিঃসন্দেহে বিনা দ্বিধায় সাহিত্যিক সত্যের পক্ষাবলম্বন করবে। সাহিত্যিকের যদি কোন আল্লাকে মানতে হয় তা হলে সে আল্লা হচ্ছেন–'আল হক্কুন' অর্থাৎ যিনি হক বা সত্য। প্রচলিত অর্থে আল্লার গুণাবলী নিরানব্বই হোক কি তেত্রিশ কোটি হোক তাতে কিছু এসে যায় না---তা যে হক্ বা সত্যের রকমফের, এ উপলব্ধি যার নেই তার পক্ষে মুখে আল্লার নাম নেওয়া শয়তানের ধর্মগ্রন্থ আবৃত্তিরই সমতুল্য। সত্যের এ বোধটুকু না থাকলে সাহিত্যিক যেমন হওয়া যায় না তেমনি হওয়া যায় না সাহিত্যের বিচারক বা সমঝদার। প্রসঙ্গত বলতেই হচ্ছে আমার 'রাঙ্গা প্রভাত' নামক উপন্যাস পড়ে জনৈক অধ্যাপক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জাতীয় আদর্শবিরোধী, পাকিস্তান বিরোধী, ইসলাম বিরোধী ইত্যাকার বহু সাংঘাতিক অভিযোগে বইটাকে সংবাদপত্রের পাতায় অভিযুক্ত করেও ক্ষান্ত হতে পারেন নি। শুনেছি এ বিষয়ে তিনি প্রদেশের স্বরাষ্ট্র বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করবারও চেষ্টা করেছেন। জাতীয় আদর্শ খুব একটা মস্ত বড় বস্তুও যদি হয়, তা হলেও জিজ্ঞাসা করা যায় তা রক্ষা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব কি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ? ঐ বিভাগের কর্মচারীদের ঐ সম্পর্কে জ্ঞানের বা মূল্যায়নের দৌড়ই বা কতটুকু ? সাহিত্য বিচারের ভার শেষ পর্যন্ত যদি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উপরই ন্যস্ত হয় তা হলে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হওয়ার কারণ ঘটে না কি ? আশ্চর্য, সাহিত্য শিল্পের উপর স্বরাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় বলে, এরাই আবার সোভিয়েট রাশিয়ার নিন্দায় পঞ্চমুখ। এদের মতে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের যে ধর্ম মানবতার চেয়ে তা বড়। এ মত আমি বিশ্বাস করি না, মানিও না। কথাটা হয়তো 'রাঙ্গা প্রভাত'-এ কিছুটা সোচচার হয়েছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি জায়গায় যে অমানুষিক কাণ্ড ঘটে গেলো তাতে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। এ সবে যারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধার্মিকের অভাব ছিল না—এদের অনেকে হাতের ধারাল ছোরাটা উদ্যত করেছে ঈশ্বর ও আল্লার নাম নিয়েই। ঈশ্বর ও আল্লার পরিবর্তে এদের দিলে যদি কণামাত্রও মানবতার ছোঁয়া লাগতো তা হলে এমন কাজ তাদের দ্বারা কখনো সম্ভব হত না। এদের সম্বন্ধেই বার্ণার্ড শ'র বিখ্যাত উক্তি Beware of that man whose God is in heaven. একটু বদলিয়ে বল্লে কথাটা আরো প্রত্যক্ষ হয়ঃ যাদের আল্লা শুধু ঠোঁটে আর তসবিতে তাদের থেকে সাবধান।

ধর্ম আর সিক্যুলারিজম আজ স্রেফ মুখের বুলিতে পর্যবসিত। ধার্মিক না হয়েও ধর্মের নামে গদগদ হওয়া আর মনে সিক্যুলার না হয়েও সিক্যুলারিজমের নামে মুক্তকচ্ছ হওয়া তেমন কোন বিরল দৃশ্য নয়। আজকের দিনে যদিও সিক্যুলারিজমের অর্থ করা হয় "ধর্মনিরপেক্ষতা"—আসলে ওটাও একটা পোশাকী ধর্ম—সাম্প্রদায়িকতার আর একটি নতুন নাম। এও এক রকম 'মিটিংকা কাপড়া'। রাজনৈতিক ডোল বদলের বেশী এর কোন মূল্য নেই। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ কি খুলনায় যারা অশান্তি ঘটিয়েছে তারাও তো ইসলাম ধর্মাবলম্বী, যে ইসলামের অর্থ শান্তি। ধর্মকে এ স্ববিরোধিতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে মানুষের দৃষ্টি ধর্মের দিক থেকে মনুষ্যত্বের দিকে ফেরাতে হবে। কোন রকম ধর্মতন্ত্র নয়, মানবতন্ত্রকেই করতে হবে আজ সব দেশের ও সব রাষ্ট্রের আদর্শ। ব্যক্তি বা সমাজজীবনেও এর থেকে বড় আদর্শ আমার মনের দিগন্তে আমি খুঁজে পাই না।

খাঁটি অর্থে কোন ধর্মের পক্ষেই আজ তার নিষ্কলুষ আদি স্বরূপ রক্ষা করা সম্ভব নয়—সম্ভব নয় সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া—বিশেষ করে পাকিস্তান-হিন্দুস্থানে। না পাওয়ার একটা বড় কারণ রাজনীতি আর ধর্ম আমাদের দুই দেশে আজ এক। রাজনীতিবিদের মুখে এখন ধর্মের যত বুলি শোনা যায় স্বয়ং ধর্ম-প্রবর্তকদের মুখেও কোন দিন তত ধর্ম বুলি শোনা যায় নি। কারণ তাঁরা বুলির চেয়ে ধর্ম-পালনে ছিলেন অধিকতর বিশ্বাসী। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। বিজ্ঞানের অগ্রগতিও হয়ত অন্যতম কারণ—ধর্মের অনেক বিশ্বাস যার সঙ্গে নৈতিক-বোধ

ও সামাজিক ন্যায়চেতনা জড়িত তা আজ এক রকম ধূলিসাৎ। যা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ নয় তা আর মানুষকে প্রভাবিত করতে পারছে না। তাই সব রকম ধর্মীয় নীতিবোধ আজ শিথিল—ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন থেকে বিযুক্ত। ফলে যে-কোন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোক এখন দোজখের জল্লাদ থেকে তাঁর এলাকার থানার দারোগাকে অনেক বেশী ভয় করে থাকেন।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটা খুব ভালোভাবেই দেখা গেছে যে, ধর্ম বা সিক্যুলারিজম কোনটাই মানুষকে বাঁচাতে পারে না, পারেনি। কাজেই ধর্ম নয়, সিক্যুলারিজমও নয়, একমাত্র মানবতার উপরই দিতে হবে জোর। ধর্মের কথা বল্লেই অনিবার্যভাবে অন্য ধর্মের কথা এসে পড়ে। সিক্যুলারিজমের সঙ্গেও বৈপরীত্যের কল্পনা অবিচ্ছিন্ন। যারা সিক্যুলার নয় তাদের শত্রু ভাবতে সিক্যুলারিজম-বিশ্বাসীর মোটেও বাধে না। বামপন্থীদের কণ্ঠস্বরও আজ কিছুমাত্র আশাপ্রদ নয়। সম্প্রতি ভারতীয় লোক-সভা ও পশ্চিম বঙ্গ আইনসভায় যে বিতর্ক দেখা গেল তা রীতিমত আতঙ্কজনক।

কাজেই মানুষকে অমানুষিকতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে মানবতাকেই করতে হবে একমাত্র অবলম্বন। কথা আছে: বাঘ বাঘের মাংস খায় না কথাটা সত্য। বাঘও বাঘের বেলায় নিজেদের সাধারণ ব্যাঘ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন। ব্যাঘ্রত্বে পরস্পর অভিন্ন। অতএব অবধ্য। মানুষকেও সচেতন করে তুলতে হবে সাধারণ মানবতা সম্বন্ধে। এখন ধর্ম আর সিক্যুলারিজমের উপর জোর দিতে গিয়ে আমরা সাধারণ মানবতাকে শুধু খাটো নয় প্রায় মুছে ফেলেছি আমাদের জীবন থেকে। আমরা নির্ভেজাল মুসলমান বা নির্ভেজাল হিন্দু কি না এ-দাবিই আজ সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ—পাশাপাশি দুই দেশের দুই বৃহত্তর সমাজে আজ এ দাবিই সবচেয়ে উদগ্র। নির্ভেজাল মানুষ হোক—এ স্বাভাবিক দাবি কোথাও শোনা যায় না—পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র এ দাবি অনুপস্থিতিতেই বিশিষ্ট।

অন্য মানুষটাও আমার মতই মানুষ—এ বোধ ও চেতনাকে ব্যাপক ও ব্যবহারিক করে তুলতে না পারলে মানুষের রক্ষা নেই। ধর্ম বা সিক্যুলারিজম মানবতার স্থান নিতে পারে না। প্রাণপণে দুই বিপরীত ধর্ম পালন করে কোথাও মিল হয়েছে এমন নজির আমার জানা নেই। দুই ধর্মের দুই ধার্মিকে সত্যকার সখ্যতা বা আন্তরিকতাও বিরল ঘটনা—আত্মীয়তা ত

অবিশ্বাস্য। হিন্দু মহাসভা আর জমা'আতে ইসলাম একই মঞ্চে মিলিত হয়ে একই কর্মসূচীতে হাত মিলাবে এ কল্পনার বাইরে। শুভ-বুদ্ধিওয়ালা কেউ কেউ যে বলে থাকেন, মুসলমান খাঁটি মুসলমান আর হিন্দু খাঁটি হিন্দু হলেই মিলন সহজ হবে—একথা আমার কাছে সোনার পাথরবাটি; বরং মানুষ যখন এবং যেখানে প্রচলিত মুসলমানীত্ব ও হিন্দুয়ানীকে ছাড়িয়ে গেছে সেখানে মিলন সহজ ও অবাধ হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানে যে কয়টা বৈবাহিক সম্পর্ক হয়েছে তাও এ দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। এটা মানবতার দিকেরই ইঙ্গিত। এ মনোভাব বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হলে মিলন ও সহযোগিতার দিগন্ত অনেক বেড়ে যাবে। সযত্নে নিজের মুসলমানীত্ব কি হিন্দুয়ানীও রক্ষা করবো এবং সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষ' হিসেবেও বড় ও মহৎ হবো এ হয় না, যেমন হয় না নিজ নিজ পুকুরে গোসল করে সমুদ্র-স্নানের স্বাদ পাওয়া। সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার বহর অনেক বেশী—ধর্মে ধর্মে বিরোধও সব চেয়ে বেশী এ আনুষ্ঠানিকতায়। অথচ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া ধর্মের স্বরূপ জনসাধারণের কাছে অবোধ্য। নিরাকার ঈশ্বরের মতো ধর্মের বৃহত্তর আদর্শ বা আবেদনও থেকে যায় ওদের কাছে তাই অনুপলব্ধ। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাই কে হিন্দু আর কে মুসলমান এ বোধটাকে খুব বড় করে তোলে। এর ফলে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মৃত্যু ঘটে নি এবং সব রকম আনুকূল্য সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্রেই একটা সুসংহত জাতীয়তা গড়ে ওঠে নি। বলা বাহুল্য সাধারণ মানুষের কাছে অনুষ্ঠানই ধর্ম—ফলে যে-কোন অজুহাতে এরা যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে বা এদেরে উত্তেজিত করে তোলা হয় তখন ধর্মের নামে মানুষ হত্যায়ও এরা মনের দিক থেকে আর কোন বাধা পায় না।

একবার এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ ধার্মিক আর সাহিত্যিকে পার্থক্যটা কোথায় ?

উত্তরে বলেছিলামঃ ধর্মগ্রন্থে যদি নির্দেশ দেওয়া থাকে যে, বিধর্মীকে কতল করলে তোমার জন্য বেহেস্তে সর্বোত্তম কামরাটি খাস রাখা হবে আর দেওয়া হবে তোমাকে সত্তর হাজার হুর (সংখ্যাটা কাল্পনিক নয় এক ওয়াজের মজলিসে শুনেছিলাম), তাহলে ধার্মিক জন সুযোগ পেলে এ নির্দেশ পালন করতে কিছুমাত্র ইতস্তত করবে না। ইতস্তত করার বা

পালন না করতে পারার একমাত্র অন্তরায় পার্থিব আইন—অধিকতর ও প্রত্যক্ষ পুলিশ। কিন্তু সাহিত্যিক এমন নির্দেশ শুধু যে পালন করবেন না তা নয়, বরং অবিশ্বাস্য বলে এমন নির্দেশকে তিনি তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দেবেন। মানুষ মেরে বেহেস্তে যাওয়ার কল্পনাই তাঁর চিন্তার বাইরে। স্বয়ং ঈশ্বর নেমে এসেও যদি তাঁকে এমন নির্দেশ দেন, সাহিত্যিক তেমন ঈশ্বরকেও নিজের লেখন কক্ষ থেকে বের করে দিতে দ্বিধা করবেন না। ঈশ্বর নামধেয় কারো পক্ষে এমন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব এ কথাটাই সাহিত্যিকের কাছে অবিশ্বাস্য। কিন্তু ধার্মিক ত সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করে না। কারণ, ধর্ম আর শাস্ত্রীয় ব্যাপার নিয়ে বিচার করাটাই তার কাছে অধর্ম। তার একমাত্র অবলম্বন অন্ধ বিশ্বাস আর অন্ধ অনুসরণ। একজনের জন্য সত্তর হাজার হুর সম্ভব কি অসম্ভব, সম্ভব হলেও একত্রে অতগুলি হুর দিয়ে সে কি করবে এ সব অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রশ্নও তার মনে উদয় হয় না—হলেও উত্তর সন্ধানে সে নিস্পৃহ অথবা শঙ্কিত। সে উত্তর যতই লজিক্যাল বা যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, তার কাল্পনিক পরিণাম ভেবে সে আরো বেশী ভীত। যে মানুষ লজিক বা যুক্তির সম্মুখীন হতে ভয় পায়, তার কাছে মননশীলতা বা মুক্তবুদ্ধির চর্চা এক নিষিদ্ধ ব্যাপার। এমন মানুষকে সত্তর হাজারের পরিবর্তে সত্তর লক্ষ বল্লেও সে বিশ্বাস করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। হয়তো ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে আরো বেশী উৎফুল্ল, আরো বেশী বেপরওয়া ধার্মিক হয়ে উঠবে। যে মানুষ জীবনে একটা হুর সামলাতেই গলদঘর্ম, মৃত্যুর পর সে সত্তর হাজার সামলাবার অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে—এমনতর অদ্ভুত বিশ্বাসই সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ ও সম্মোহিত করে রাখে।

বলা বাহুল্য সংসারে বা সমাজে অর্থাৎ জীবিত লোকে অলৌকিকতার বিন্দু-বিসর্গ মূল্যও নেই—এখানে যা কিছু মূল্য তা বাস্তব আর প্রত্যক্ষের। তাই যে অলৌকিকতার উপর ধর্ম আর তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে মানুষের মন ফিরিয়ে তাকে মানবতার দিকে—যে মানবতা বাস্তব, প্রত্যক্ষ, সামাজিক, ব্যবহারিক ও যুক্তিনির্ভর। সে দিকে ফেরাতে হবে। মানবজাতির শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করছে এ সাধনা আর এর সাফল্যের উপর। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ ইচ্ছা মতো নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠান পালন করুক তাতে কারো লাভ-লোকসান ঘটে না। কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাকে বড় করে তুল্লেই ঘটে মুস্কিল. তখন এমন সব সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যার সমাধান এক কথায় 'বন্যহংস'।

আজ পাকিস্তান আর হিন্দুস্থানে এ 'বন্যহংস' ধরার প্রতিযোগিতাই চলেছে। স্বাধীনতার পর এ দুই দেশে ধর্মানুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি মশার বংশবৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। অথচ এ-দুই দেশে নৈতিক মান সব রকমে পূর্বতন রেকর্ড ভঙ্গ করে অধঃপতনের পাতালপুরীর দিকেই আজ দ্রুতগতিতে ধাবমান। জীবনবিচ্ছিন্ন ধর্মচর্চার এ এক শোচনীয় পরিণতি। আমার বিশ্বাস ধর্ম সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। ধর্ম আজ অনেকের জীবনে 'অন্য পাঁচটা বৈষয়িক বস্তুর সামিল---পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার। অথচ এরা বাস্তব ও পার্থিব যুক্তি বিচারের কষ্টিপাথরে ধর্মকে যাচাই করতে নারাজ। ধর্ম আর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শব্দ ও নানা উক্তি বহু ব্যবহারে আজ এমন একটা নির্জীব অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তা মনে আর কোন আবেদন বা উপলব্ধিরই চমক লাগায় না। চরিত্র ও নীতিবোধের পরিবর্তে তসবির জনপ্রিয়তা, মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি বা হরি সংকীর্তনে কণ্ঠস্বরের প্রতিযোগিতা মোটেও সামাজিক অগ্রগতির দিগদর্শন নয়। বরং এ যুগে ওটাও এক রকম Playing to the gallery---ওতে খেলায় জেতা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন: মন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। আজ মন্ত্র পাঠ বা তস্‌বীহ তেলাওয়াৎ মননশীলতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এক জড় ব্যাপারে পরিণত। মুখে আরবী বা সংস্কৃত বুলি যতই উচ্চারিত হোক তার অর্থ কি, জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটুকু (জীবন মানে শুধু ব্যক্তিগত জীবন নয়, অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে যে জীবন) এ সব জিজ্ঞাসা যদি মনে কোন ভাবনার সৃষ্টি না করে, ভেতরটা যদি কোন নতুন তরঙ্গে সাড়া না দেয় তা' হলে অমন উচ্চারণ অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হলেও নিষ্ফল শ্রম ছাড়া কিছুই না।

পৃথিবীর এখন বয়স হয়েছে, সভ্যতা সংস্কৃতিরও বয়স কম নয়, লিপিবদ্ধ ধর্মের আয়ুও কয়েক হাজার বছর। প্রাথমিক স্তরে জীবনধারণ বা সভ্যতার জন্য যেসব উপকরণ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হোত, আজ তার অনেক কিছু অকেজো বলে পরিত্যক্ত। সভ্য জীবন যাপনের জন্য তা আর অপরিহার্য মনে করা হয় না। তেমনি ধর্মেরও প্রাথমিক স্তরের অনেক কিছুই আজ জীবনের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছে। ধর্ম-জীবনও যে সামাজিক জীবন---সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই তার যা কিছু মূল্য, এ বোধ না থাকলে ধর্ম জীবনবিমুখ হয়ে পড়তে বাধ্য। যেমন এখন হয়েছে।

ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর পর স্বর্গে গেল কি নরকে গেল তা মানবজাতির কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। কিন্তু মৃত্যুর আগে লোকটা সৎ ও সামাজিক ছিল কিনা তা সব মানুষেরই ভাবনার বিষয়। কারণ তার এ-জীবনের সঙ্গে বহু মানুষের সুখ-দুঃখ জড়িত---জড়িত সামাজিক স্বাস্থ্য, শান্তি, নিরাপত্তা ও ভারসাম্য। স্বর্গের বা নরকের জীবন ব্যক্তিগত ও একক---ঐ দু' জায়গায় কোন সামাজিক জীবন আছে বা থাকবে তেমন কথা কোন ধর্মগ্রন্থেই উল্লেখিত হয় নি। কিন্তু এখানকার যে জীবন তা পুরোপুরি সামাজিক ও সমষ্টিগত। এ সামাজিক বা সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই তেমন অশরীরী ব্যাপারকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিলে, আদর্শ ও লক্ষ্য করে তুললে বিভ্রান্তি ঘটাই স্বাভাবিক। জীবনে যারা জীবনকে ভালোবাসে না, ভালোবাসে মৃত্যুকে অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবনকে, বলা বাহুল্য, এ হুর-পরীবর্জিত, দুধের নদ-নদীশূন্য পৃথিবী তাদের জন্য খুব উপযুক্ত বাসস্থান নয়। এ-জন্যেই বলছি যা পরকালের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ ধর্ম, তার উপর জোর না দিয়ে যা এ জীবনের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ মানবতার ওপর জোর দেওয়াই উচিত। মানুষের কল্যাণ এ দৃষ্টিভংগীর সঙ্গে জড়িত।

ব্যক্তিগতভাবে কিম্বা সামাজিকভাবে ধার্মিক হওয়ার যে আমি বিরুদ্ধে তা নয়। ধর্ম যদি মনুষ্যত্বের পরিপূরক বা নামান্তর না হয় তা হলে ধর্মে আর মনুষ্যত্বে পদে পদে সংঘর্ষ অনিবার্য। আমার বিশ্বাস খাঁটি অর্থে যারা ধার্মিক তারা কখনো নিজের কি অপরের মনুষ্যত্বকে আঘাত হানতে পারে না---পারে না মানবতাকে কিছুমাত্র খাটো করতে। আমার বক্তব্য ঃ নিছক আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের দ্বারা কেউ ধার্মিক হতে পারে না। যেমন হতে পারে না খাঁটি সাহিত্যিক স্রেফ সাহিত্যের পেশাদারী অধ্যাপনা করে। জীবনের সার্বিক দৃষ্টিভংগীটাই আলাদা হওয়া চাই---আর তা হওয়া চাই ব্যক্তির সমস্ত সত্তার সঙ্গে জড়িত। ভেতরে ধর্মবোধ না থাকলে আর বহু সাধনায় তাকে অন্তরঙ্গ করে তুলতে না পারলে সত্যিকার ধার্মিক হওয়া অসম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস। ধর্মজীবনের ব্যাপ্তি সামাজিক জীবনে ছড়িয়ে না পড়লে তার মূল্যই বা কতটুকু? ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষের কাছে যদি কোটি টাকাও থাকে তাতে সমাজের কি এসে যায়, যদি তার এক ভগ্নাংশও সমাজদেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারে সহায়তা না করে? সমাজের দিক থেকে এর চেয়ে স্তূপীকৃত মৃত্তিকাখণ্ডের মূল্য অনেক বেশী। ঘরে বসে কোটিবার তসবিহ্ জপা আর কোটি টাকা সিন্দুকে

বন্ধ করে রাখা ব্যবহারিক দিক থেকে একই ব্যাপার—এ দু'য়ের কিছুমাত্র সামাজিক মূল্য নেই। কোটি টাকা যা কোটি পুণ্যও তাই—সামাজিক মূল্যই এ দু'য়ের মূল্য। আগেই একবার বলেছি ব্যক্তিবিশেষ স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে তার আগাম দুশ্চিন্তায় কারো পক্ষে ব্লাড প্রেসার বাড়ানোর কোন মানে হয় না।

মন্দিরে মসজিদে গির্জায় কে কি রকম আচরণ করে, সেজদায় গিয়ে কে দীর্ঘতর সময় কাটায় তা মোটেও বড় কথা নয়। কোন মানুষ বত্রিশ আনা হিন্দু বা চৌষট্টি আনা মুসলমান কি খ্রীষ্টান হলেও পৃথিবীর কোন লাভ-লোকসান ঘটে না। কিন্তু বাইরে, অর্থাৎ সমাজে এবং পরিবারের ও যদি আট আনা মানুষও হয় তাহলেই পৃথিবী বেঁচে যায়। আজ পৃথিবী এমন মানুষের প্রতীক্ষায় যে মানুষের একমাত্র অভীপ্সা মানুষ হওয়ার—মানুষের মতো আচরণ করার।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর তাবৎ পৃথিবীর মালিক। এ-সব কথা সামাজিক দিক থেকে স্রেফ হাওয়ায় বেলুন ওড়ানো। এর কোন সামাজিক মূল্যই নেই। এতে কোন সামাজিক তথা মানবীয় সমস্যারই সমাধান হয় না। এ-সব ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের অঙ্গ হতে পারে। কিন্তু কোন বিশ্বাসই সামাজিক শান্তি বা শৃংখলা আনতে সক্ষম নয়। তার এক বড় প্রমাণ, কোথাও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিলে লোকে পুলিশ ডাকে, আল্লাহ্ বা ভগবানকে ডাকে না।

ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে আইনের শাসনে শৃংখলাবদ্ধ না করলে তা সহজে পরস্বাপহরণের অজুহাত হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটা গল্প শুনেছিলাম:

এক ব্যক্তি প্রায়ই মসজিদ থেকে কোরান শরীফ চুরি করতো আর চুরি করার সময় এ ভাবে সাফাই দিতো আল্লার কাছে: আল্ আব্দু আবদুল্লাহ্, আল্ বায়তু বায়তুল্লাহ্, আল্ কালামু কালামুল্লাহ্ অর্থাৎ এ বান্দাও আল্লার বান্দা এ ঘরও আল্লার ঘর, এ কোরানও আল্লার কালাম! অতএব (তার মতে) এতে কোন অন্যায় বা পাপ নেই। অধিকতর সেয়ানা আর এক ব্যক্তি এটা টের পেয়ে একদিন লাঠি হাতে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখে শুনে

আজদ্যরবো জরবোল্লাহ্ অর্থাৎ মারটাও আল্লার মার বলে, চোরটাকে বেদম লাঠি পেটা করে ছাড়লে!

মনে হচ্ছে এ চোর এবং দণ্ডদাতা উভয়ে আল্লার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। একই বিশ্বাসের লজিক বা যুক্তি দু'জন মানুষকে কেমন পরস্পরবিরোধী কার্যকলাপে অনুপ্রাণিত করেছে তা দেখে রীতিমতো অবাক হতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছেঃ আল্লার সার্বভৌমত্বের এমন ধারা ধারণা যদি সামাজিক ও নাগরিক জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে, তা'হলে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? জগৎ সংসারের উপর আল্লার সার্বভৌমত্ব যদি ভাবলোকে অর্থাৎ থিওরেটিকেলী স্বীকার করা হয় আর ব্যবহারিক জীবনে করা হয় সম্পূর্ণ অস্বীকার, তা'হলে পদে পদে আত্মপ্রবঞ্চনা করাই হবে মানুষের নিয়তি। ব্যবহারিক জীবনে স্বীকার করা হলে কি দশা ঘটে তার নজির ওপরে উল্লেখিত চোর ও তার দণ্ডদাতা। মসজিদ বা কোরানের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে অথবা একটা চোর ও একজন দণ্ডদাতার সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে এ ধারণা ও বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করলে আমার বিশ্বাস সামাজিক জীবন আর জঙ্গল-জীবনে কোন পার্থক্যই থাকবে না। গৃহস্থ ও চোর উভয়েই যদি অন্তরের সঙ্গে পার্থিব ব্যাপারেও আল্লার সার্বভৌমত্ব মেনে নেয় আর তা প্রাত্যহিক জীবনে পরীক্ষা করতে শুরু করে, তা'হলে অবস্থাটা যা দাঁড়াবে তা কল্পনা করতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন আইন বলে যদি কিছু থাকে তা একই সঙ্গে গৃহস্থ এবং চোর উভয়ে নিজ নিজ স্বার্থানুসারে নিজ নিজ হাতে তুলে নিতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করবে না। যেমন উপরে বর্ণিত চোর ও দণ্ডদাতা করে নি। পার্থিব ব্যাপারে আল্লাহ্ ও ধর্মকে টেনে আনলে তা এমনি দু'ধারী করাত হয়ে উঠবে।

আমার বক্তব্যঃ যা অপার্থিব তাকে অপার্থিব থাকতে দিন—যা পার্থিব তাকে সর্বতোভাবে পার্থিবের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ রাখুন। অপার্থিবের তথা আধ্যাত্মিকের প্রেরণা ও তৃষ্ণা মানুষ যে একেবারে অনুভব করে না বা তার কোন প্রয়োজন নেই তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছি তা ব্যক্তিগত সাধনা ও উপলব্ধির ব্যাপার। তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে টেনে আনায় আমার আপত্তি, টেনে আনলে শুধু সামাজিক জীবন নয় আধ্যাত্মিক জীবনও নাজেহাল হয়। সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ পার্থিব

ব্যাপার—যে মানুষ নিয়ে সমাজ সে মানুষও আগাগোড়া পার্থিব। কাজেই অপার্থিবের দোহাই দিয়ে এমন সমাজকে শাসন-পরিচালনা করতে গেলে তা ব্যর্থ হবেই। এ ব্যর্থতার নজির আজ সর্বত্র। কেতাবের ইসলাম আর জীবনের ইসলামের মাঝখানে আজ বিরাজ করছে এক প্রশান্ত মহাসাগর। সব ধর্মের বেলায় এ কথা সত্য।

মানুষের মধ্যে একটা সনাতন মেষ-প্রবৃত্তি আছে। জিজ্ঞাসা ও মননশীলতার অভাব ঘটলে মনের সে মেষ-প্রবৃত্তিটাই একক হয়ে ওঠে। তখন গতানুগতিকতা আর অন্ধ অনুসরণই চরম মোক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। গত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করেছে ধর্ম মানুষকে মানুষের হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি। ধর্মযুদ্ধ কথাটাই একটা স্ববিরোধী উক্তি। ধর্মকে মানবতার ওপর স্থান দিতে গিয়েই মানুষ এ ধরনের বহু স্ববিরোধিতার শিকার হয়েছে। যার ফলে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে অপরিমেয় ধ্বংস নেমে এসেছে। আর এ ধ্বংসের পেছনে এক বড় ভূমিকা নিয়েছে পরকাল—সে পরকাল অদৃশ্য, অপ্রামাণ্য ও সম্পূর্ণ অপার্থিবকে পার্থিবের এলাকায় টেনে আনলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। আল্লার সার্বভৌমত্বকে জাগতিক ব্যাপারে টেনে আনলে যে গোলকধাঁধার সৃষ্টি হয় তাতে প্রবেশের পথ পাওয়া গেলেও বের হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান বা বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে বিশ্ব ও মানবসৃষ্টি সম্বন্ধে যদি ধর্মীয় মতবাদও মেনে নেওয়া যায়, তা'হলেও জাগতিক ব্যাপারে আল্লার সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার বিপদ অনেক, যেমন অনেক বিপদ সন্তানের উপর পিতা-মাতার সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার। তাই কোন ইসলামী রাষ্ট্রেও শেষোক্ত সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি পায়নি। স্বয়ং ইসলামের নবীও ঐ ধরনের সার্বভৌমত্ব নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তাঁর নবী জীবনের শুরুতে। অথচ আল্লার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের চেয়ে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক অধিকতর প্রত্যক্ষ ও অধিকতর বাস্তব।

যে ধর্ম ইহকালে মানুষকে রক্ষা করতে পারেনি, পারছে না—সে ধর্ম পরকালে মানুষকে রক্ষা করবে এমন অলৌকিক বিশ্বাসে কেউ যদি স্বস্তিবোধ করেন তাতে আপত্তি করার কোন কারণ নেই; কিন্তু আমার আপত্তি হচ্ছে অলৌকিককে লৌকিক ব্যাপারে টেনে আনায়। বলা বাহুল্য দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র এ সবই লৌকিক ব্যাপার।

আর পরলোকে যদি কোন 'প্রবেশিকা' পরীক্ষা হয় তা হলে মানুষের জন্য মনুষ্যত্বের পরীক্ষা না হয়ে ধর্মের তথা ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের পরীক্ষা হবে, তেমন বিশ্বাস মানববুদ্ধির অপমান। ঈশ্বরের অপমান আরো বেশী—কারণ তখন তাঁকে খাটো করে টেনে এনে বসানো হয় সুপরিচিত গুরু-মশায়ের আসনে।

পাকিস্তান হিন্দুস্তানের আয় আর দায় অর্থাৎ Assets and liabilities ভাগ-বাটোয়ারার সময় আল্লাহ্ নাকি পাকিস্তানের ভাগেই পড়েছেন। তবে তখন তা আয় না দায় ভালো করে বোঝা যায় নি। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে পাকিস্তানের এ এক মস্ত বড় দায়। দোহাই—কথাটি আমার নয়, আমি মরহুম জাষ্টিস কায়ানীর ভাষণ থেকেই চুরি করেছি।

প্রমাণ হিসাবে এ প্রসঙ্গে তাঁর শেষ মন্তব্যটাও উদ্ধৃত করছিঃ

"Undoubtedly the Lord God is an asset when the nation is going to ruin, but in the name of the Lord God, the Beneficent, the Merciful, some of us are apt to develop a narrow pseudo-religious outlook as though the Lord God belonged to us only, and were not the Lord of the Universe, which is the true meaning of Rabbul Alamin. And that is how He is made a Liability. (*Vide* : Not the Whole Truth : Page—186.)

বলা বাহুল্য এ বই'র ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট। শুধু ভূমিকা নয়—কায়ানীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন তিনি। এ Liability বা দায় আমাদের শাসনতন্ত্রে শুধু নয় সমাজের প্রতিস্তরেও অনুপ্রবেশ করে কি রকম আত্মপ্রবঞ্চনা ও বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠেছে, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছিঃ মাত্র কয়েক বছর আগে-কার ঘটনা। পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির বার্ষিক সভা। ঐ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি চট্টগ্রামের প্রাক্তন কমিশনার মিঃ এন. এম. খান আই. সি. এস। কি কারণে সেবার তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি। সভাপতিত্ব করছেন সহ-সভাপতি পূর্ব-পাকিস্তানের জনৈক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

সভার কাজ যথারীতি শুরু হয়েছে—কিছুদূর এগিয়েও গেছে। হঠাৎ একজন মুসল্লি মোত্তকি সদস্য বলে উঠলেন: স্যার, কোরান তেলাওয়াত হয়নি, কোরান তেলাওয়াতের পর সভার কাজ শুরু হওয়া উচিত।

সভাপতি বেকায়দায় পড়ে ইতস্তত করতে লাগলেন। সভার কাজ শুরু হয়ে গেছে, এখন হাঁ করা মানে কেঁচে গণ্ডুষ করা, না করা ত এক রকম অসম্ভব। কায়ানী সাহেব যে দায়ের কথা বলেছেন সে দায় রক্ষা না করে উপায় নেই। অগত্যা সভাপতি আমতা আমতা করে বললেন: আচ্ছা তেলাওয়াত করুন, আপনিই করুন। কয়েক মিনিটের জন্য কর্মসূচী মুলতবী রেখে তাই করা হলো।

পরের বৎসর আবার সে একই প্রতিষ্ঠানের একই বার্ষিক সভা—একই স্থানে উপস্থিত সদস্য-শ্রোতারাও, একই মুসল্লী মোত্তকি সদস্যরাও সদলবলে হাজির। কিন্তু ঘটনাচক্রে এবার স্থায়ী সভাপতি স্বয়ং এন. এম. খান উপস্থিত—তিনিই সভাপতিত্ব করছেন। এন. এম. খান দুর্দান্ত অফিসার এ খবর সবারই জানা। পরিচিতদের সঙ্গে কুশল জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে তিনি সভার কাজ শুরু করে দিলেন—বিনা তেলায়াতে, বিনা ভূমিকায়। কেউ টুঁ শব্দটিও করলেন না। সে মুসল্লি মোত্তকি সদস্যটিও কোরান তেলাওয়াতের কথা এবার ভুলে রইলেন বেমালুম। 'নাচ গানে ভরপুর' বিচিত্রানুষ্ঠানেও কোরান তেলাওয়াত করে শুরু হতে দেখেছি। অকারণে ধর্মকে কোথায় টেনে আনা হচ্ছে এ-সব তারই দৃষ্টান্ত।

পাকিস্তানের অন্যতম চিন্তাবিদ মিঃ এ. কে. ব্রোহী তাঁর 'Religion and Freedom' প্রবন্ধটি শেষ করেছেন রবীন্দ্রনাথের এ-বিখ্যাত উক্তি দিয়ে: "I love God, because He has given me freedom to deny Him." যে ঈশ্বর বা আল্লাহ্ গুরুমশায়ের প্রতীক সে ঈশ্বর থেকে এ ঈশ্বরের ধারণা ও উপলব্ধি কি অনেক বড় ও মহত্তর নয়? আল্লার এ মহত্ত্বের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত কম্যুনিষ্ট দেশগুলি। ওরা তো ঈশ্বর, আল্লাহ্, গড কিছুই মানে না। তবুও আল্লাহ্ তাদের ক্রমোন্নতি আর সুখ-সমৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন অথবা ঐ সব দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দেশ থেকে বেশী তেমন কথা এ যাবত শোনা যায় নি। যদি বলেন ওরা মজাটা টের পাবে পরকালে গিয়ে তা' হ'লে অবশ্যই নিরুত্তর থাকতে হয়!

সব রকম অলৌকিতার অস্তিত্ব মানুষের ধারণা ও উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল —ঈশ্বর এবং পরকালও। যা কিছু মানুষের ধারণা ও উপলব্ধির বাইরে তা' শুধু অস্তিত্বহীন তা নয়, মানুষের জীবনে তার কোন দামও নেই। যে ঈশ্বর তাকে শুদ্ধ না মানবার স্বাধীনতা মানুষকে দিয়েছেন, সে ঈশ্বরের conception বা উপলব্ধি মানুষের প্রত্যয় ও আত্মমর্যাদার দিগন্তরেখা যে শুধু অবারিত করে দেয় তা নয়, মানুষকে নবতর চেতনা আর জিজ্ঞাসায়ও করে তোলে উদ্বুদ্ধ। এ-ভাবে নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে এলেই মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের শাসন তথা মানবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে সহজ। ধর্মের ওপর জোর দিতে গেলেই ঈশ্বরের আবির্ভাব অনিবার্য। আর ঈশ্বর মানে সাম্প্রদায়িক ঈশ্বর—পশ্চিমের বেলায় জাতীয় ঈশ্বর। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এক হ'লেও আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের মতো আল্লাহ্, ঈশ্বর এবং গড নিয়েও কারো সঙ্গে কারো মিল নেই—মিল হবেও না। মুসলমানের আল্লাহ্ আর হিন্দুর ঈশ্বর এক নয়, তেমনি হিন্দুর ঈশ্বর আর খ্রীষ্টানের গড্ও এক নয়—বুদ্ধ মানুষ হয়েও কোটি কোটি মানুষের আরাধ্য। এ-ভাবে যেখানে মূলের পার্থক্য, সেখানে ব্যাখ্যা আর উপলব্ধিতে তারতম্য ঘটবেই। ফলে আচার-অনুষ্ঠানেও শুধু তারতম্য নয়—বিরোধও অনিবার্য। আর দেখা গেছে অতি সহজে এ-বিরোধ হয়ে ওঠে বারুদ। নীতিহীন, মনুষ্যত্বহীন রাজনীতি এ-বারুদে অগ্নিসংযোগ করতে এক মুহূর্তও ইতস্তত করে না। ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের এটাই তো পটভূমি। কিন্তু মনুষ্যত্বের ব্যাপারে এ-বিরোধ ও উপলব্ধির দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য নেই বলে সহজে ওটাকে মানুষের স্থির মিলন-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এ করে তোলার দায়িত্ব আমাদের দু'দেশের শুধু নয়—পৃথিবীর তাবৎ বুদ্ধিজীবীদের বলেই আমার বিশ্বাস।

ধর্ম ও রাষ্ট্র

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা ও বাদানুবাদের অন্ত নেই। আর সমস্যাটা হালেরও নয়, বহু পুরানো। একটাকে আর একটার উপর নির্ভরশীল করে তুললে ধর্ম বা রাষ্ট্র কোন পক্ষের ফায়দা হয়েছে কিনা, হচ্ছে কিনা, হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু তা বিচার করতে হলে নিরপেক্ষ সত্যসন্ধিৎসা অত্যাবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্ম বা রাষ্ট্র কোন ব্যাপারেই নির্ভেজাল সত্যসন্ধিৎসা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র পরিচালকদের অসহিষ্ণুতার প্রকাশ্য মোকাবিলা এক রকম অসম্ভব বল্লেই চলে। তাই এ সম্বন্ধে সত্যসন্ধিৎসু সচেতন বুদ্ধিজীবীরাও চুপ থাকতে বাধ্য। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এ পরিবেশের জন্যই আমাদের দেশে শ', রাসেল কি হাক্সলীর মতো বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব কল্পনাই করা যায় না।

ধর্মের সঙ্গে এমন একটা বুদ্ধি বিচারহীন অন্ধ আবেগ মিশে রয়েছে যে তাকে উপেক্ষা করার সাহস কেউ-ই সঞ্চয় করতে পারছে না। গণতন্ত্রকে যদি রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলে মেনে নেওয়া হয় তা, হলে জনসাধারণ যত স্থূল ও বিচারবুদ্ধিহীন আর তাদের দাবি যতই যুক্তিহীন হোক না কেন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষীরা তাদের দাবি যে শুধু মেনে নেবে তা নয়, পদে পদেই দেবে ঐসব দাবিকে প্রশ্রয়। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে এ প্রশ্রয়ের নজির অনেক বেড়ে গেছে। কারণ, গণতান্ত্রিক পথে সুযোগ সুবিধার পথঘাটও হয়েছে এখন অনেক বেশী খোলাসা। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর কোন রকম রাষ্ট্রীয় উচ্চাভিলাষ হয়ত নেই, কিন্তু দেহটার মায়া ত আছে। তাই আত্মঘাতী জেনেও অন্ধ আবেগকে সমীহ না করে তাদেরও উপায় নেই। ফলে এ দুই শ্রেণী—রাষ্ট্রবিদ ও বুদ্ধিজীবীকে পদে পদেই গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। গোঁজামিল দিয়ে কোন রকমে টিকে থাকা যায় বটে, কিন্তু বড় কিছু করা যায় না—না রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, না সাহিত্য

শিল্পের ক্ষেত্রে, না মননশীলতায়। ধর্ম যাকে বলে স্টেটিক, অচল অনড় একটা অচলায়তনের নিগড়ে তা আবদ্ধ। ধর্মকে বলা হয় অলৌকিক অপৌরুষেয় খোদায়ী? অত্যন্ত অসন্দিগ্ধ ভাষায় বলা হয়েছে হযরত মোহাম্মদ শেষ নবী, কোরানের পর আর কোন ঐশী কেতাব নাজেল হবে না।

কাজেই এক অলংঘনীয় সীমা ও গণ্ডী টেনে দেওয়া হয়েছে মানুষের সামনে —ধর্মের ক্ষেত্রে এর বাইরে পা বাড়াবার অধিকার মানুষের নেই। এর ভালোমন্দ যাচাইয়ের বা এ-সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার অধিকার থেকেও মানুষ বঞ্চিত। ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এক ও সুনির্দিষ্ট। আমার যতটুকু ধারণা, ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মানুষের মনে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগিয়ে তোলা, তাকে ভিতরে-বাইরে সৎ ও আল্লা ভক্ত রূপে গড়ে তোলা। 'সৎ' কথাটা নিয়েই মুস্কিল। আধ্যাত্মিকতা বা আল্লা ভক্তি এমন একটা আশরীরী ব্যাপার যে তাকে ধরা-ছোঁওয়া, দেখা-শোনা, বাছ-বিচার কি পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় কিছুতেই আনা যায় না। এ সব ক্ষেত্রে শুধু মানুষ, সমাজ বা রাষ্ট্রকে যে ফাঁকি দেওয়া যায় তা নয়, নিজের মনকেও চোখ ঠারানো যায় সহজে। কিন্তু সৎ ও সজ্জীবনের দাবি এমনি প্রত্যক্ষ ও লক্ষ্যগোচর যে, তাতে নিজেকে কিছুটা ফাঁকি দেওয়া গেলেও সচেতন মানুষ বা সমাজকে ফাঁকি দেওয়ার কোন উপায়ই থাকে না। লোকটা সৎ কিনা, সৎ-জীবন যাপন করে কিনা তা সহজেই বিচার করে দেখা যেতে পারে। কারণ, সৎ-জীবন ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারিক জীবনেরই ফল। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা বা খোদাভক্তির ব্যাপারে তা কি বলা যায়? যে লোক আল্লার একত্বে আর নবীদের প্রেরিতত্বে বিশ্বাস করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজানে রোজা রাখে, সামর্থ্য থাকলে কোরবানী আর হজ্ব করে ও জাকাত দেয় তাকে প্রচলিত অর্থে ধার্মিক বা খোদাভক্ত বলে স্বীকার করতেই হয়; কিন্তু এমন লোক সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় অর্থে সৎ নাও হতে পারে। নিরপেক্ষ বিচারে এমন লোকও কি অহরহ দণ্ডিত হচ্ছে না? অর্থাৎ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ কি করছে না? মানুষকে ধার্মিক বা খোদাভক্ত করে তোলার জন্য প্রত্যেক ধর্মেই নির্দিষ্ট বিধি-বিধানের ব্যবস্থা আছে, যারা তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তাদের ধার্মিক বা খোদাভক্ত না বলে উপায় নেই। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে পালনীয় নীতি-নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কহীন এই আনুষ্ঠানিক স্বধর্মনিষ্ঠার মূল্য কতটুকু? আমাদের প্রত্যেক কোর্ট-কাছারির সঙ্গে

বা ধারে কাছে এক বা একাধিক মসজিদ আছে। এসব মসজিদে যাদের নিয়মিত দেখা যায় তাদের অনেককে আবার আসামীর কাঠগড়ায়ও কি দেখতে পাওয়া যায় না? এ-ও কি এক রকম গোঁজামিলের ফল নয়? রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এ গোঁজামিলের নজির আরো ব্যাপক। উদাহরণ দিয়ে নিজের ও ‘সমকালে’র* বিপদ ডেকে আনতে চাই না। আগে যে একবার দেহের মায়ার কথা বলেছি হয়ত সে মায়ায় আমিও এখানে গোঁজামিল দিতে বাধ্য হচ্ছি। মোটকথা ধর্মে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে সর্বত্রই আজ গোঁজামিলের রাজত্ব। আমরা যারা লিখে থাকি আমরাও এখন গোঁজামিল দিয়ে দিয়েই লিখি। আনুষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে সৎ-জীবনের মিল হলে তা যে সোনায় সোহাগা হয় তাতে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সোনার সঙ্গে সোহাগা মেশাবে কে? রাষ্ট্র? এটিই আমার এক বড় প্রশ্ন। রাষ্ট্র যদি—যে অন্ধ আবেগের কথা সূচনায় বলেছি, তার খপ্পরে পড়ে এ দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসে সে দায়িত্ব রাষ্ট্র আদৌ পালন করতে পারবে কিনা, পারা সম্ভব কিনা? পারলে কতটুকু পারবে? এসব সঙ্গত প্রশ্নের উত্তরের সম্মুখীন না হয়ে এড়িয়ে চল্লে অধিকতর গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে আমরা বাধ্য হবো। তাতে ধর্ম বা রাষ্ট্র কারো ফায়দা হবে না। মানুষ হবে নাজেহাল।

ধর্ম এক নয় কিন্তু এখন সব সভ্য ধর্মই স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস করে। তবে এ একত্বের স্বরূপ ভিন্নতর। মুসলমানের আল্লাহ্ সম্বন্ধে ধারণা ও উপলব্ধির সঙ্গে হিন্দুর ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ও উপলব্ধির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তেমনি খ্রীষ্টানদের গডের ধারণা আর উপলব্ধিও অন্যরকম। আবার বৌদ্ধরা তো বুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন অশরীরী শক্তিকেই আমল দেয় না। সম্ভবত এক সৌদী আরব ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র নেই যেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে না। আশ্চর্য, এমন সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সৌদী আরব তাদের রাষ্ট্রের নামের আগে ‘ইসলামী’ বিশেষণ যোগ করেনি। ইসলামের জন্মস্থান ও তার ধর্মীয় কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও আরবের রাজা ও রাজকুমারদের জীবনযাত্রার যে সব চমকপ্রদ কাহিনী শোনা যায় ও কাগজপত্রে পড়া যায় তা আংশিক সত্য হলেও তার সঙ্গে ইসলামের বিধি-বিধানের বিশেষ যে মিল নেই তা সহজেই অনুমেয়। তাঁদের জীবন আর ধর্মের মধ্যে যে আত্মবিরোধ রয়েছে

---

*এ লেখাটি প্রথমে “সমকাল” নামক মাসিকে ছাপা হয়েছিল।

তাঁরা হয়ত তা বুঝে গোঁজামিলের শিকার হতে চান নি। এটুকু আন্তরিকতা আর কাণ্ডজ্ঞানের জন্য তাঁরা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

গণতন্ত্র মানে সংখ্যা। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করতে গেলে নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের যে-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বেশী তাদের ধর্মানুসারেই রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে। সে ধর্মই হবে রাষ্ট্রের ধর্ম—রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতিভূ সে হিসেবে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রে বিশেষিত করা সঙ্গতই হয়েছে। কিন্তু নামকরণ এক কথা আর নামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে বাস্তবায়িত করা অন্য কথা। যে-কোন নাস্তিকেরও নাম নূরুল ইসলাম কি শামসুল ইসলাম হতে পারে; কিন্তু তাই বলে নামের বরকতে সে যে একদিন পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে উঠবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী কি করা যায়? খোদাবক্সও যে খোদাভক্ত হয় না তার নজির দেদার।

বিশেষত রাষ্ট্র একটি সমষ্টিগত ব্যাপার—অগণিত মানুষের জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক। আর আজকের দিনের কোন সভ্য রাষ্ট্রই বিচ্ছিন্ন ও একক নয়—তাবৎ পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। যে মানুষ ও মানুষের জীবন নিয়ে রাষ্ট্রের কারবার সে মানুষ ও তার জীবন চলিষ্ণু, পরিবর্তনশীল ও জঙ্গম। অথচ ধর্ম হচ্ছে তার বিপরীত। চৌদ্দ শত বছর আগেও ধর্ম যা ছিল এখনো তাই আছে, চৌদ্দ শত বছর পরেও তাই থাকবে। যে কোরান হাদিসের নির্দেশ মতো রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন প্রণয়নের দাবি উঠেছে, মানুষের জীবনে সহস্র রদবদল ঘটলেও তার রদবদল ঘটানো মানুষের সাধ্যাতীত। অথচ আজকের মানুষ আর চৌদ্দ শত বছর আগের মানুষ কখনো এক নয় এবং চৌদ্দ শত বছর পরের মানুষও এ মানুষ থাকবে না। তাদের জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা, আশা-আকাঙক্ষা, রুচি ও মূল্যবোধ স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। জীবনের সমস্যাও হবে ভিন্নতর।

ইসলামের বিধি-নিষেধের দূরতম ব্যাখ্যার দ্বারাও প্রচলিত সিনেমা ইত্যাদিকে সমর্থন করা যায় না, তবুও এসব কি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়নি, পাচ্ছে না? রাষ্ট্রের নাম ইসলামী করার দাবি যাঁরা তুলেছেন তাঁরাও এযাবত সিনেমাকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান নি। অর্থাৎ এখানেও সে গোঁজামিল।

আমাদের শাসনতন্ত্র রচয়িতা আর রাষ্ট্র পরিচালকগণ কেউ-ই ইসলামী

ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নন, কিন্তু তাঁরা অনেকেই আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত। তাই পাকিস্তানকে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার উপরই জোর দিচ্ছেন অথচ এদিকে 'গণতন্ত্রের' ভয়ে ধর্মীয় আবেগের কাছে নতি স্বীকার না করেও পারছেন না। তাই রাষ্ট্রের নামে 'ইসলামী' বিশেষণ বার বার জোড়া ও ছাড়া হচ্ছে। যারা ছাড়ছেন তাঁরাই আবার জুড়ছেন। এ শুধু অন্তর্দ্বন্দ্ব বা গোঁজামিলের নিদর্শন নয় —ধর্মকে রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যাপারে টেনে নিয়ে এলে এরকম গোঁজামিলের আশ্রয় নিতেই হবে এবং তার সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে যাবে।

রাষ্ট্র শাসিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় কতগুলি আইন ও বিধি-বিধানের দ্বারা, যার রচয়িতা মানুষ। আর এসব আইন ও বিধি-বিধান রচিত হয়েছে রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষের সুখ-সুবিধা-নিরাপত্তা ও ক্রমোন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে। বলাবাহুল্য, এ সম্পূর্ণভাবে জাগতিক পার্থিব ব্যাপার, এর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্কই নেই। আগে বলেছি আধ্যাত্মিকতা অশরীরী ব্যাপার। অশরীরী কোন বিষয়ে রাষ্ট্রের হাত দিতে যাওয়া মানে চোরাবালিতে পা দেওয়া—গোঁজামিলের আড়ালে উটপাখী হওয়া। ভূত-পরী ও দেও-জ্বীনকে কি আইনের এক্তেয়ারভুক্ত করা সম্ভব?

একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটি বঝতে চেষ্টা করা যাক। আমাদের শাসনতন্ত্রের মূলসূত্র ও আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, পৃথিবীর তথা পাকিস্তানের যাবতীয় ধন-সম্পদের একমাত্র মালিক আল্লাহ্। কথাটা অতি উত্তম—শুনতেও মধুর। এক শ্রেণীর ধর্মীয় আবেগের এ এক চরম অভিব্যক্তি। তবে অধিকাংশ সস্তা বুলির মতো এও কি এক অবাস্তব উক্তি নয়? কথাটা মিথ্যা বলছি না। আল্লাহ্ সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্তত ঈমান ও বিশ্বাসের দিক থেকে এ বিষয়ে বোধ করি কোন মুসলমানের মনেই দ্বিমত আশা করা যায় না। কিন্তু শাসনতন্ত্র ত ব্যবহারিক জীবনের জন্য—তার ঘোষিত বিধি-বিধান ও উদ্দেশ্য যদি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা না যায়, অন্তত প্রয়োগের ব্যবস্থা করা না হয় তা হলে এসব ঘোষণা ও উক্তি কি ফাঁকা বুলিতে পর্যবসিত হয় না? খেয়ালী পোলাও-র বেশী এর মূল্য কতটুকু? বিশ্বের উপর আমাদের যখন কোন কর্তৃত্ব নেই, বিশ্বের কথা আপাতত মুলতুবীই থাক। পাকিস্তানের যাবতীয় সম্পদের মালিক যদি আল্লাহ্ই

হন আর তা যদি আমরা রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে স্বীকার করে নিই তা হলে যুক্তিসঙ্গতভাবে আমাদের এ-ও স্বীকার করে নিতে হয় যে, আল্লাহ্‌র যে সব বান্দা পাকিস্তানে বাস করে তাদের সকলেরই পাকিস্তানের যাবতীয় সম্পদের উপর সমান হক ও অধিকার রয়েছে। এ না মানলে পূর্বোক্ত ঘোষণা কি অর্থহীন হয়ে পড়ে না? আর শাসনতন্ত্রের বিধি-বিধান ও আইনের দ্বারা তাকে বাস্তবায়নের যদি ব্যবস্থা করা না হয় তা হলে স্বভাবতই বুঝতে হবে নেহাৎ ফাঁকি আর গোঁজামিল দিয়েই জনগণের অন্ধ আবেগকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে শুধু ঐ উচ্চরোল ঘোষণার মারফত; আর বুঝতে হবে শাসনতন্ত্রের মূল সূত্র ও আদর্শকে বাস্তবায়নের মতলব কারো নেই—না শাসনতন্ত্র রচয়িতাদের, না যাঁরা এ শাসনতন্ত্রকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁদের। অথবা এ যত বড় মহৎ আদর্শই হোক একে বাস্তবায়ন যে-কোন রাষ্ট্রেরই সাধ্যাতীত। কোন্‌টা সত্য? আমার বিশ্বাস, মূল সূত্র ও আদর্শের সঙ্গে যদি শাসনতন্ত্রের সঙ্গতি থাকত তা হলে তাকে বাস্তবায়নের বিধি-বিধানও শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট হতো এবং পাকিস্তানের সমস্ত ধনসম্পদকে নাগরিকদের মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দেওয়ার জন্য যথোপযুক্ত আইন-কানুনও এতদিনে রচিত হতো। অন্তত তার আলামত দেখা যেতো। ধন বণ্টনের পাঁচসালা কি দশসালা পরিকল্পনার চেহারা আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম। এতদিনে কোন নির্বাচিত গ্রাম কি থানা বা জেলার অথবা কোন প্রশাসনিক বিভাগে এ সমতা বিধানের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সম্পদকে সকল বান্দার মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যেতো! কিন্তু তার কোন পরিচয় বা আভাস কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি? বরং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অতি অল্পসংখ্যক লোক, ঘটনাচক্রে যাঁরা রাষ্ট্রের উপরতলায় স্থান পেয়েছেন তাঁরা যে মাইনে বা রোজগারের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন অধিকাংশ নাগরিক তার শতাংশ থেকেও বঞ্চিত। এ অবস্থার রদ-বদলের কোন পরিকল্পনাই যেখানে নেই, সেখানে সব ধনসম্পদের মালিক আল্লাহ্‌, এ কথা ঘোষণার কোন মানে হয় কি? স্রেফ এ ঘোষণার দ্বারা আল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র বান্দা কারো ফায়দা হচ্ছে কি না তাও জিজ্ঞাস্য। অবশ্য এটুকু ফাঁকা কথায় অনেকের ধর্মীয় আবেগ যে চরিতার্থ হয়েছে ও হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কিছুটা বিশদভাবে বুঝতে চেষ্টা করলে ধর্মকে কিভাবে

ফাঁকি ও গোজামিলের হাতিয়ার করে তোলা হয়েছে তা আরো বেশী করে ধরা পড়বে। ইসলাম অশরীরী, খেয়ালী বা ভৌতিক কিছু নয়। ঈমান অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্বে ও নবীর প্রেরিতত্বে বিশ্বাস—ইসলামের সর্বপ্রধান শর্ত এবং একমাত্র এটিই অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ এটাকে চোখে দেখে সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের কোন উপায় নেই। ফলে, ফাঁকি দেওয়াও সহজ। এমন ফাঁকিবাজ বা মুনাফেকদের কথা কোরানে একাধিক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ বিশ্বের তাবৎ সম্পত্তির মালিক—ঈমানের মতো এটাও একটা অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাসের কথা। রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে বিশ্বাসকে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা না করলে এখানেও ফাঁকির ক্ষেত্র থেকে যায় প্রশস্ত। এ-কথা উপরে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। ধনসম্পদকে আইন করে বণ্টন করা এমন অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু যেটা নিছক বিশ্বাসের ব্যাপার তাকে আইন বা রাষ্ট্রীয় বিধির আওতায় আনা কিছুতেই সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত স্বীকৃতি ছাড়া এ বিষয়ে অন্য রকম সাক্ষী বা প্রমাণও অচল। অথচ ব্যক্তিগত স্বীকৃতির উপর আইন বা দণ্ডবিধি নির্ভর করে তাকে চৌর্যাপরাধ থেকে অব্যাহতি কোন দেশের আইনই দেবে না। কিন্তু ঈমান বা বিশ্বাসের বেলায় তেমন সাক্ষী-প্রমাণের সুযোগ কোথায়? আর তেমন অপরাধের স্তরবিভাগও করা যাবে কি করে? ধরুন কোন রাষ্ট্রে যদি এমন আইন করা হয়: যে পাঁচ-ওয়াক্ত নামাজ পড়বে না সে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে। সে জাতীয় পরিষদের সদস্য হতে পারবে না এবং পারবে না মন্ত্রী হতে। তা'হলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখা যেতে পারে। যে-কোন ইসলামী রাষ্ট্রে এমন আইন যে শুধু যুক্তিসঙ্গত তা নয়, অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়ও। রাষ্ট্রের নাম ইসলামী দিয়ে বাহবা কুড়াবেন অথচ যে বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের উপর ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে আইন ও রাষ্ট্র বিধানে আমল দেবেন না, একি এক মস্ত স্ববিরোধী ব্যাপার নয়? দিলেও বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কি? আল্লাহ্‌ রসুলে একদম বিশ্বাস করেন না এমন নাম মাত্র মুসলমান মুসলমান সমাজেও কম নেই—আর তাঁরাও যে জাতীয় পরিষদ সদস্য ও মন্ত্রী হতে চাইবেন তাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর তা হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাঁরা যে শুধু নামাজ পড়বেন তা নয়, পাঁচওয়াক্ত নামাজ তাঁরা জমাতের সঙ্গেই পড়বেন এবং আমি জোর করে বলতে পারি পল্টন ময়দানের জমাতে তাঁরা বিনা অজুতেও শরিক হবেন। তাঁরা যে বাড়ি থেকে অজু করে আসেননি তা আপনি প্রমাণ করবেন কি করে?

এ আইন প্রয়োগের জন্য আলাদা একটা আই, বি, ডিপার্টমেণ্ট খুললেও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

শুনেছি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরে ওলেমাদের এক প্রতিনিধিদল কায়েদে আজমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নামাজকে সারা পাকিস্তানে অর্ডিনেন্সের সাহায্যে বাধ্যতামূলক করার দাবি জানিয়েছিলেন। পাকিস্তান যখন মুসলিম রাষ্ট্র তখন তাকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে হলে ইসলামের প্রধান স্তম্ভ নামাজকে বাধ্যতামূলক করা উচিত—এটাই ছিল তাঁদের প্রধান যুক্তি। উত্তরে কায়েদে আজম নাকি বলেছিলেন—এ করতে গেলে এ নতুন রাষ্ট্রের সব উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজ বন্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি এ অর্ডিনেন্স প্রয়োগেই নিয়োগ করতে হবে আর শহরে-বন্দরে গ্রামে-মহল্লায় সর্বত্র খালি জেলখানাই তৈয়ার করতে হবে আর মোতায়েন করতে হবে পুলিশ। তাঁর সহজ কাণ্ডজ্ঞানের দ্বারা কায়েদে আজম সেদিন এভাবে ওলেমাদের ধর্মীয় আবেগকে নিবৃত্ত করেছিলেন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতার অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব সেদিন তাঁর সহায় হয়েছিল। যদি তর্কের খাতিরে আমরা মেনেও নেই যে, অর্ডিনেন্স বা আইনের সাহায্যে নামাজকে যদি বাধ্যতামূলক করা হয় তা' হলে পাকিস্তানের সব মুসলিম নাগরিকই নামাজ পড়তে শুরু করবেন—আল্লাহ্‌র ভয়ে না হলেও আইনের ভয়ে ত বটেই। তা হলেও সমস্যা অন্যদিক থেকে দেখা দেবে—অত লোকের নামাজের জায়গা কোথায়? নামাজের বয়সী অন্তত পাঁচ ছ' কোটি লোকও যদি থাকেন আর তাঁরা যদি নামাজ পড়তে চান তা হলে কতটা মসজিদ দরকার তা একবার ভেবে দেখুন। রাষ্ট্রের সমস্ত রাজস্ব এ খাতে ব্যয় করলেও তাতে কুলাবে কিনা বিবেচ্য। নামাজ অবশ্য ঘরেও পড়া যায় কিন্তু তা' হলে আইনের তদারক চলবে কি করে? মসজিদে মসজিদে পুলিস মোতায়েন সম্ভব হলেও ঘরে ঘরে পুলিশ মোতায়েন কি সম্ভবপর? যে-কোন আইন মানা ও প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা তদরারকের ব্যবস্থা না থাকলে দু'দিনেই তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম ইত্যাদি অপরাধ সম্পর্কীয় আইন তদারক করার জন্যে যদি পুলিশ, থানা, বিচার ও দণ্ডের ব্যবস্থা না থাকত এসব অপরাধ কিভাবে বেড়ে যেত একবার কল্পনা করে দেখা যেতে পারে। এ সব অপরাধ সম্বন্ধে কোরান-হাদিসে নিষেধ আর হুঁশিয়ারির ত অন্ত নেই। তাতে কুলাচ্ছে না বলেই

ত আইনের আশ্রয় গ্রহণ। নামাজের বেলায় কি তা হবে না?

নামাজকে আইনের এক্তেয়ারভুক্ত করলে (তা না করলে ইসলামী রাষ্ট্র যা অনৈসলামিক রাষ্ট্রও তা, কারণ কোরান-হাদিসের নির্দেশ সব দেশেই সমান প্রযোজ্য) রাষ্ট্রকে কি রকম অসাধ্য অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে তার যে ইঙ্গিত উপরে দিয়েছি তা কাল্পনিক বিবেচিত হতে পারে এবং আপাতত তা যে কাল্পনিক আমি নিজেও তা স্বীকার করছি। কিন্তু হজ্বের ব্যাপার ত মোটেও কাল্পনিক নয়, আর হজ্বও তো ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ—সক্ষম ও সামর্থ্য মুসলমানের অন্যতম অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সে হজ্বও কি আজ মানুষ অবাধে পালন করতে পারছে? রাষ্ট্র নিজেই কি তার এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি? ধরুন পাকিস্তানের আট কোটি মুসলমানের মধ্যে অন্তত বিশ লক্ষ লোকের উপরও যদি হজ্ব ফরজ অবশ্য পালনীয় ধর্মীর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়—ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা সবাই কি হজ্ব করতে যাওয়ার রাষ্ট্রীয় অনুমতি পাবে? এমন কি আগামী দশ বছরেও এরা সবাই হজ্ব করার সুযোগ পাবে কিনা সন্দেহ। এ দশ বছরে এদের এক মোটা অংশ যে মারা যাবে তাও বোধকরি সহজে অনুমান করা যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও স্রেফ রাষ্ট্রীয় বাধার ফলে এরা যে ইসলামের অবশ্য পালনীয় একটি ধর্মীয় কর্তব্য করতে পারল না, আল্লাহ্‌র কাছে তার যদি জবাবদিহি করতে হয় তা কে করবে? রাষ্ট্র না সে গুনাহ্‌গার বান্দা? কিন্তু এ গুনাহ্‌র জন্য সে ত মোটেও দায়ী নয়। সে অত্যন্ত আহাল দিলেই হজ্বে যাওয়ার জন্যে দরখাস্ত করেছিল, (এমনকি শরীয়তের নিষেধ অমান্য ক'রে পাসপোর্ট সাইজ ফটোও তুলেছিল) প্রয়োজনীয় টাকা সরকারী ব্যাঙ্কে দিয়েছিল জমা, তবুও হজ্ব করার অনুমতি মিলল না তার। কোরান-হাদিসের নির্দেশে ধর্ম-কাজ করার জন্যে সরকারী কর্মচারীর কাছে (যারা অধিকাংশই হয়ত শরীয়ত মোতাবেক জীবন-যাপন করে না) দরখাস্ত করা তথা অনুমতি ভিক্ষা কি ধর্মের সঙ্গে একটা বড় রকমের রাষ্ট্রীয় পরিহাস নয়? স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকরা যদি স্বেচ্ছামতো স্বাধীনভাবে ইসলামের নির্দেশ পালনে রাষ্ট্রের কাছ থেকেই বাধা পায় তা হলে 'স্বাধীন' আর 'ইসলামী' কথাটার কোন অর্থ হয় কি? আসল কথা ধর্মকে রাষ্ট্রের সঙ্গে আর রাষ্ট্রকে ধর্মের সঙ্গে জুড়ে দিতে গেলেই এ অদ্ভুত গোঁজামিল স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হতেই হবে। কারণ, ধর্ম অলঙ্ঘনীয়—তার নির্দেশ ও বিধান অপরিবর্তনীয়। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র স্থাণু নয়—প্রগতিশীল বলেই

তা পরিবর্তনশীল। আর বিচ্ছিন্ন নয় বলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নানা স্বার্থে ও বিচিত্র আইন কানুনে তা শৃঙখলিত। পাসপোর্ট, ভিসা, যানবাহন সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদি সব কিছুই আধুনিক রাষ্ট্রের এক একটি শৃঙখল। আধুনিক রাষ্ট্র অনায়াসে ধর্মের শৃঙখল বা বিধিবিধান ভেঙে চুরমার করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিধানে বিশেষ করে যে সব বিধানের সঙ্গে অন্য দেশের রাষ্ট্রীয় নীতির সম্পর্ক রয়েছে তার পান থেকে চুন খসাতেও অক্ষম। হজের ব্যাপার তার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অথচ পাকিস্তান ও সৌদী আরব দুই-ই মুসলিম রাষ্ট্র।

নামাজ রোজাকেও আইনের আওতায় আনতে গেলে ঐ একই সমস্যা দেখা দেবে। বলাবাহুল্য, যে-কোন আইনের মতো এ আইনও কেউ মেনে চলবে কেউ মোটেও মানবে না। নিজের রচিত আইনের প্রতি রাষ্ট্রের যদি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তা'হলে এ দু'পক্ষের মোকাবিলা রাষ্ট্রকে করতেই হবে। এক পক্ষের জন্য গ্রামে গ্রামে বানাতে হবে মসজিদ আর অন্য পক্ষের জন্য জেলখানা। আর লোক-সংখ্যানুপাতে মোতায়েন করতে হবে পুলিশ— এ আইন পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য। ফলে এমন অবস্থাও হতে পারে যে, দেশের অর্ধেক লোক যাবে জেলে আর অর্ধেক নেবে পুলিশের চাকরি। এ করে দেশে ইসলামী শাসন কায়েম হবে কিনা জানিনা; তবে দেশের মানুষের খাওয়া-পরার সমস্যা যে অনেকখানি চুকে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। দেশে তখন কয়েদী আর পুলিশ এ দুই শ্রেণী ছাড়া যে লোক থাকবে তার সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য হতে বাধ্য। আধুনিক রাষ্ট্র এক জটিল ব্যাপার, তার আইন-কানুনও জটিলতর। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে হজে যেতে হলে পাসপোর্ট ভিসা কি বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যার মোকাবিলা করতে হতো না কারো। তখন যানবাহনের সমস্যা ও তার আইন-কানুন ছিল না এত তীব্র ও কঠোর। আজকের দিনে যা সমস্যা তা আধুনিক রাষ্ট্রেই সমস্যা। আধুনিক রাষ্ট্র এসব সমস্যা কিছুতেই এড়াতে পারে না। পারে না বলেই হজের মতো ধর্মীয় ব্যাপারেও পাকিস্তান রাষ্ট্র (ইসলামী হয়েও) নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে, ফটো ও লটারির মতো শরীয়তবিরোধী পথে না গিয়ে মানুষ আজ অবশ্য পালনীয় শরীয়ত কর্মও করতে পারছে না।

অন্য ধর্মের মতো ইসলামেও সম্প্রদায়ের অন্ত নেই এবং এদের মধ্যে ধর্মীয়

আচার-অনুষ্ঠানের তারতম্যও কম নয়। তবুও রাষ্ট্রবিদরা যখন কোরান-হাদিসের দোহাই দিচ্ছেন তখন ধরে নিতে হবে তাঁরা এবং দেশের অধিকাংশ মানুষ কোরান-হাদিসের ইসলামকেই পাকিস্তানে বাস্তবায়িত হতে দেখতে চান। উপরে ইসলামের যে পাঁচ স্তম্ভের কথা বলেছি তা নিশ্চয়ই কোরান-হাদিস সমর্থিত ও নির্দেশিত এবং এগুলির বাইরে বা এগুলিকে বাদ দিয়ে কোন ইসলামের ধারণা করতে আমি অন্তত অক্ষম। ইসলামী শাসন মানে আমি মনে করি ইসলামের এই পাঁচ হুকুম-আহকামকে জীবনে রূপায়িত করা, কোরান-হাদিসের নির্দেশ অনুসারে দেশের যাবতীয় আইন প্রণয়ন করে সে আইনের দ্বারা দেশকে শাসন করা অর্থাৎ কোরান-হাদিসে যে যে অপরাধে যে যে দণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেভাবে দেশের দণ্ড-বিধিকে সংশোধন করে তা প্রয়োগ করা। এর বাইরে ইসলাম কি বস্তু তা আমার জানা নেই---এ সবকে বাদ দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র সোনার পাথর-বাটির চেয়েও স্ববিরোধী উক্তি বলেই আমার বিশ্বাস। আশ্চর্য, ইসলামের যাকে পঞ্চখুঁটি বলা হয় তার সঙ্গে যাঁদের কোন সম্পর্ক নেই তাঁরাই আজ মোটা গলায় দাবি তুলছেন ইসলামী রাষ্ট্রের। এঁরা ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবি করছেন বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই স্বাভাবিক দাবিটুকু করছেন না যে, যাঁরা এ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করবেন আর শাসনতন্ত্রকে যাঁরা বাস্তবায়িত করবেন, এ-রাষ্ট্রের প্রশাসনিক যন্ত্রকে যাঁরা দিনে দিনে পরিচালিত করবেন তাঁদের সকলকেই কোরান-হাদিস অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে। অন্তত ইসলামের যে পাঁচ রোকন যাঁরা পালন করবেন না তাঁরা কোন রাষ্ট্রীয় পদেই বহাল থাকতে পারবেন না।

অথচ তেমন দাবি উঠেছে বলে এযাবত শুনিনি এবং তেমন আইন-কানুন রচিত হয়েছে বা রচনার উদ্যোগ চলছে বলেও জানা যায়নি। খাঁটি মুসলমান ছাড়া ইসলামী শাসন বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে কে? যে হাকিম নিজে নামাজ পড়ে না সে হাকিম নামাজ না পড়ার জন্য শাস্তি দেবে অন্যকে—কথাটা এক বড় রকমের পরিহাস নয় কি? দাবি জানানো হচ্ছে কোরান-হাদিসের পরিপন্থী কোন আইন করা চলবে না। এ-ও তো এক নেতিবাচক কথা। যদি দাবি করা হতো পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ও আইন-কানুন সব কিছু কোরান-হাদিসের নির্দেশানুসারেই রচিত হবে বা রচিত হোক---তা হলেই অধিকতর সঙ্গত হোত। আগেই বলেছি আমাদের রাষ্ট্রবিদরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত। তাঁরা

মনে মনে ভালো করেই জানেন এ যুগে শাস্ত্রীয় নির্দেশানুসারে কোন রাষ্ট্রের আইন ও শাসনবিধি রচিত হলে তার সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার বাধা ও সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই ফাঁকি ও গোঁজামিলের মুখোশ পরে জনসাধারণের তথাকথিত ধর্মীয় আবেগকে ঘুম পাড়িয়ে তাঁরা সস্তায় কাজ হাসিল করতে চান। এ না হলে তাঁদের রাজনৈতিক জীবনই যে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তাঁরা ভাল করেই জানেন নামাজী কালামী হওয়ার চেয়ে মন্ত্রী হওয়ার মূল্য ঢের বেশী। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজীর চেয়ে বে-নামাজী মন্ত্রীর দাপট যে কতখানি বেশী তা কারও অজানা বা অদেখা নয়। বলেছি আধুনিক রাষ্ট্রীয় নীতি ও ধারণার সঙ্গে ধর্মীয় বিধিবিধানের সংঘর্ষ অনিবার্য। এ সংঘর্ষের স্বরূপ আমরা হজের বেলায় দেখেছি, আরো বেশী যদি দেখতে চান তো সুদের বেলায়, সিনেমা ও নাচগানের বেলায়ও দেখতে পাবেন। এ সবই পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ভাবে স্বীকৃত—সুদও তো আমাদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির এক অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যক্তিগতের সীমা ছাড়িয়ে নামাজ-রোজাকেও রাষ্ট্রীয় আইনের এক্তেয়ারে নিয়ে এলে তাও নতুন নতুন সংঘর্ষেরই সৃষ্টি করবে। আমাদের ছাত্রাবস্থায় একবার রমজান মাসে সলিমউল্লাহ্ মুসলিম হলের ডাইনিং হল বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে এক নাছোড়বান্দা ছাত্র আদালতে নালিশ করেছিল। যতদূর মনে পড়ে বিচারে ছাত্রটিরই জয় হয়েছিল। আধুনিক কালে আইনের সাহায্যে জোর করে ধর্ম পালন করা যাবে কিনা এও এক রীতিমত বিরাট প্রশ্ন। এক দিকে বছর বছর ঘটা করে 'মানবাধিকার দিবস' পালন করা অন্য দিকে নামাজ-রোজাকে রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে বাধ্যতামূলক করা হলে তাতে মতামত ও উপাসনার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত হবে কিনা, বিশ্ব রাজনীতির পটভূমিতে সে প্রশ্নও উঠতে পারে।

আজ প্রায় সব সভ্য রাষ্ট্রই বিশ্ব জাতি সংস্থার (U. N. O.) সদস্য আর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ সব আইন কোন ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করে রচিত হয়নি—রচিত হয়েছে আধুনিক জীবনের চাহিদা ও প্রয়োজনানুসারে এবং এসবই আধুনিক রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও ধারণার পরিপূরক। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী খ্রীষ্টান, অধিকাংশ নাগরিকও খ্রীষ্টান এ অজুহাতে হঠাৎ যদি সেখানে আইন করা হয় যে, সব ইংরেজকেই প্রতি রবিবারে গির্জায় হাজির হতে হবে এবং মানতে হবে

যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের সন্তান তা হলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকাংশ ইংরেজ শুধু যে বিদ্রোহ করবে তা নয়—আন্তর্জাতিক আদালতে এ আইনের বিরুদ্ধে নালিশও উঠতে পারে। সে আদালতের অধিকাংশ বিচারক খ্রীষ্টান হলেও তাতে বাইবেলের নির্দেশ যে হালে পানি পাবে না তাও সুনিশ্চিত। ভারতে হিন্দু ধর্মানুসারে পূজা অর্চনা আর পাকিস্তানে নামাজ রোজা আইনের সাহায্যে বাধ্যতামূলক করলেও একই অবস্থার বরং এর চেয়েও খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবেই। আসল কথা এ যুগে কোন রাষ্ট্রই ধর্মভিত্তিক হতে পারে না, পারবে না। করতে গেলেই ধর্মকে ফাঁকি ও গোঁজামিলের আড়ালে মুখ ঢাকতে হবে। তাই আমার বিশ্বাস ধর্ম ও তার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ নিয়ে আধুনিক কোন রাষ্ট্রই হালে পানি পাবে না। দৃষ্টান্ত আগেও দিয়েছি, আরো দিচ্ছি। সুদ, প্রাণীর ছবি, মদ, বেশ্যা—এ সবই কোরান-হাদিসে সুকঠোরভাবে নিষিদ্ধ—মুসলিম বা 'ইসলামী রাষ্ট্র' হয়েও পাকিস্তানে এ সবই রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রীয় অনুমতি ছাড়া নগ্ন বা অর্ধ নগ্ন কোন ছবিই আমদানি করা যায় না, তেমনি লাইসেন্স ছাড়া মদ আমদানি বা বিক্রিও অসম্ভব। বহু শহরে-বন্দরে যে সব বেশ্যা নিবাস রয়েছে তাও রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা স্বীকৃত—অনুমোদিত। বলা বাহুল্য এ সবই আধুনিক রাষ্ট্রের অনুষঙ্গ। ধর্মের দোহাই বা নির্দেশ এগুলিকে কিছুতেই বাতিল করতে পারে না। পারলে রাষ্ট্রের নামের সঙ্গে 'ইসলামী' বিশেষণ যোগ করার আগে পাকিস্তানে কোরান-হাদিসের বরখেলাপকারী সব কিছুকে নিশ্চিহ্ন করা উচিত ছিল। তা করা কি সম্ভব? (রাষ্ট্রীয় দফতর থেকে যে খতিয়ান বের হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের মদ্যপানের পরিমাণ বছর বছর বেড়েই চলেছে—সরকারী অনুমতি ছাড়া একি সম্ভব?) তা করতে হলে সমস্ত পৃথিবীটাকেই নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে—করতে হবে নতুন সমাজ বিন্যাস, বিশেষ করে বর্তমান অর্থনীতিকে বদলাতে হবে গোড়া থেকে আগা অবধি। বর্তমানে 'স্বাধীন দুনিয়ার' রাষ্ট্রের পক্ষে এ করার ক্ষমতা আছে কিনা আমার জানা নেই তবে পাকিস্তানের যে সে ক্ষমতা নেই সে সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত।

কোরান-হাদিসের বাইরে যে ইসলাম সে ইসলাম সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। আমার ধারণা সত্য, ন্যায়, সামাজিক সুবিচার, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ইত্যাদি যে সব বড় বড় বুলি শোনা যায় এর কোনটাই ইসলামের একচেটিয়া নয়। সব ধর্ম ও সব রাষ্ট্রেই এগুলি স্বীকৃত—এমনকি 'কাফেরী'

রাষ্ট্রেও 'মিথ্যা' শুধু নিন্দনীয় নয়, দণ্ডনীয়ও। খ্রীষ্টানী মুল্লুক ইংলণ্ড-আমেরিকা আজ 'মাঙ্গলিক' দেশে পরিণত যেখানে ধনী-দরিদ্র কারো চিকিৎসার খরচ লাগে না। আর পাকিস্তানে ইসলামের 'সামাজিক ন্যায় বিচার' এখনো রাষ্ট্রবিদদের উচ্চরোল বক্তৃতা আর কেতাব কোরানেই সীমাবদ্ধ। চিকিৎসার মতো মানবীয় ব্যাপারেও পাকিস্তানে ধনী-দরিদ্রের সুযোগ-সুবিধার আসমান-জমিন পার্থক্য বোধ করি কারো নজর এড়াবার কথা নয়। 'ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, ইসলামী সুবিচার' ইত্যাদি জীবন ও বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন বড় বড় বুলি না আউড়িয়ে যা কিছু সর্বমানবীয় সত্য তার দিকে আমাদের রাষ্ট্রের পদক্ষেপ হলে একই সঙ্গে রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়েরই মঙ্গল হতো। তা ছাড়া ছোট-বড় সব বুলিই ফাঁকা হতে বাধ্য। কারণ তার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। কথার বাইরে তার অস্তিত্ব অনুপস্থিত।

'স্বর্গ রাজ্য', 'ধর্ম রাজ্য', 'রাম রাজ্য', ইত্যাদি বহু বুলিই শোনা গেছে। এ-সবের কি অর্থ আমি প্রশ্ন করে এ যাবত কোন সদুত্তর পাইনি। যাঁরা এ সব বুলি আওড়ান তাঁদের নিজেদেরও এ সব বিষয়ে কোন স্পষ্ট ও সঠিক ধারণা নেই। ঢাকায় একবার এক সেমিনারে জনৈক সুপণ্ডিত অধ্যক্ষ এক প্রবন্ধ পড়েছিলেন। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে আশা প্রকাশ করেছিলেন—'অচিরে পাকিস্তান স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।' সভাশেষে তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম ভাই, স্বর্গরাজ্য কাকে বলে? তিনি ভ্যাবাচেকা খেয়ে চেয়েই রইলেন আমার দিকে, কোন উত্তরই দিতে পারলেন না। মোট কথা স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই কোন ধারণা নেই—না থাকারই কথা। স্বর্গরাজ্য আমি যেমন দেখিনি, তিনিও দেখেন নি। একটা 'পবিত্র আশা' প্রকাশ করতে হবে তাই করা। আসলে ঐ বুলি একটা আকাশকুসুম মাত্র। 'ইসলামী রাষ্ট্র' কথাটাও যাঁরা বলেন তাঁদের মনেও ঐ রাষ্ট্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন ধারণা যে আছে তা নয়, তাঁরাও ঐ শবদ দু'টার আড়ালে আর এক রকম আকাশকুসুমেরই চাষ করে থাকেন। এর সঙ্গে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ জড়িত রয়েছে বলে আপাতত এর চাষ জমছে ভালো।

সভ্যতার সংকট

মানুষের একটা বড় পরিচয় সে ভাবতে পারে। করতে পারে যে-কোন বিষয়ে চিন্তা। যে চিন্তা ও ভাব মানুষকে সাহায্য করে মানুষ হতে। পশুপাখীকে পশুপাখী হতে ভাবতে হয় না—পারেও না ওরা ভাবতে বা চিন্তা করতে। সে বালাই ওদের নেই—যে-টুকু পারে তার পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ—বাঁচা ও প্রজননের মধ্যে তা সীমিত। সভ্য-অসভ্যের পার্থক্যও এ ধরনের। যারা যত বেশী চিন্তাশীল সভ্যতার পথে তারাই তত বেশী অগ্রসর। আর চিন্তার ক্ষেত্রে যারা পেছনে পড়ে আছে, সভ্যতারও পেছনের সারিতেই তাদের স্থান। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি, দেশ সবের বেলায় এ সত্যের তারতম্য নেই। মোট কথা সভ্যতার প্রথম সোপানই হল চিন্তা—চিন্তার অভ্যাস তথা বুদ্ধির চর্চা।

শুধু রসের দিক বা সৌন্দর্য সাধনার দিক যেমন সাহিত্যের সব কিছু নয়, তেমনি সভ্যতার বেলায়ও শুধু আনন্দ ও আরাম আয়েসের উপকরণ বাহুল্য কখনো সভ্যতার সব কিছু নয়। এমনকি সভ্যতার বড় অংশও নয় এসব। সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক রয়েছে মানুষের হৃদয়, মন ও চরিত্রের আর মানসিক উৎকর্ষের। মাত্রাধিক আরাম ও উপকরণ বাহুল্য এ সবকে দৃঢ় ও পুষ্ট করে তোলার পরিবর্তে বরং করে তোলে আরো শিথিল ও দুর্বল। আজ সভ্যতা মানে উপকরণ-প্রাচুর্য ও গতি। আধুনিক সভ্যতার বাহন হয়েছে এ দুই অপদেবতা। দ্রুতগামী বায়ুযানে কে কত হাজার মাইল ঘুরে এলো, কার আগে কে পৃথিবী চক্কর দিতে পারলো—এ হলো এখন সভ্যতার মাপকাঠি।

মানুষ ভাববে কখন, চিন্তা করবে কখন—জীবনের গভীরত্ব উপলব্ধির অবসর কোথায় আজ মানুষের? তাই আজ মানুষের জীবনে কোন দর্শন নেই।

নেই কোন নীতিনিষ্ঠা ও চারিত্রিক সততা। ফলে মানুষের মন থেকে মানুষের সভ্যতা আজ আশ্রয়চ্যুত।

প্রাচীন জীবন-দর্শন থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন অথচ নতুন কোন জীবন-দর্শনও গড়ে ওঠেনি। সব জীবন-দর্শনের গোড়া হল চিন্তা—চিন্তার চর্চা। মানুষের জীবন থেকে আজ চিন্তার ক্ষেত্র অপসারিত—ফলে কোন জীবন-দর্শনই আজ মানুষের সামনে নেই। সিনেমা, টেলিভিশন-রেডিও, গ্রামোফোন যেখানে মানুষের অবসর সময়টুকুর অধিকাংশ গ্রাস করে চলেছে, সেখানে চিন্তা চর্চার সময় কোথায়? ফলে আজ ধীরে ধীরে, নিজের অজ্ঞাতেই মানুষ যন্ত্রের সামিল হয়ে পড়েছে। মানুষের এখন যা নিয়ে অধিকাংশ সময় কাটে তা হচ্ছে যন্ত্র ও যান্ত্রিকতা। একজন মনীষী বলেছেন: If you live too long with a machine, you begin to grow like it. এ কারণেই মানুষ হয়ে পড়েছে আজ যান্ত্রিক। হৃদয়, মন, আবেগ অনুভূতি সবই যন্ত্রের সুরে বাঁধা। আমি এমন পরিবারও দেখেছি যাঁরা এক ঘুমের সময় ছাড়া আর সব সময় নিজেদের রেডিও যন্ত্রটা খুলে রাখেন। নিস্তব্ধতার যে একটা অনির্বচনীয় শান্তি আছে এঁরা তার স্বাদ থেকে ত বঞ্চিত থাকেনই তদুপরি নিজেদের সুকুমার বৃত্তির উপর কি যে নিষ্করুণ উৎপীড়ন এঁরা করছেন তাও বুঝতে পারেন না। অতি-যান্ত্রিকতার এ হচ্ছে পরিণাম। এসব মানুষের জীবনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে ভাববার বা অন্ন-চিন্তার অতিরিক্ত অন্য চিন্তা করবার অবসর কোথায়? ফলে জীবন-দর্শন সম্বন্ধে এঁদের কোন মাথাব্যথা থাকার কথাই নয়। রেডিও বাজানোকেই এঁরা মনে করেন চরম সংস্কৃতিচর্চা! এ যুগের বিখ্যাত চিন্তাবিদ, মানব-কল্যাণে উৎসর্গিত প্রাণ Albert Schweitzer বলেছেন: "With the spirit of the age I am in complete disagreement, because it is filled with disdain for thinking." চিন্তার প্রতি এই বিরাগ ও বিতৃষ্ণা মানব সমাজে এক মারাত্মক ব্যাধির রূপ নিয়েছে আজ। আজ সভ্যতার যে সংকট তা হচ্ছে এই চিন্তাহীনতার সংকট। আণবিক বোমা বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য মারণাস্ত্র নয়। তথাকথিত 'শীতল যুদ্ধ'ও এই চিন্তাহীনতার ফল। জীবনের মূল্য ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবতে ভুলে গিয়েছে আজ মানুষ। ফলে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সবই প্রায় হয়ে পড়েছে নীতিভ্রষ্ট। বুদ্ধি ও চিন্তার চর্চা মানুষকে যুক্তিবাদী ও বিবেকী করে তোলে। যে-কোন অবস্থায় বিবেকী মানুষ হিরোশিমা ও নাগাসাকি ঘটাতে পারে না। বিবেকহীন সভ্যতা মানুষকে বর্বরতার কোন চরম

সীমায় নিয়ে গেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এদু'টি নাম তার অক্ষয় স্বাক্ষর। নীতি ও জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া যান্ত্রিক সভ্যতা ও তার প্রগতি মানুষকে কোন লক্ষ্যেই নিয়ে যায় না। চিন্তাহীনতার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে Schweitzer-এর মন্তব্য হচ্ছে: "Renunciation of thinking is a declaration of spiritual bankruptcy where there is no longer a conviction that men can get to know the truth by their own thinking, skepticism begins. Those who work to make our age skeptical in this way, do so in the expectation that as a result of denouncing all hope of self-discovered truth, men will end by accepting as truth what is forced upon them with authority and by propaganda."

নীতি ও জীবনের মূল্য সম্বন্ধে অবিশ্বাসের চরম পরিচয় মেলে যুদ্ধ ও তথাকথিত জাতীয় সংকটের সময়। তখন নীতি, ন্যায়, ধর্ম, সত্য ও মূল্যবোধ সবই হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়। যান্ত্রিক সভ্যতার চরম কাম্য যে-কোন মূল্যে জয় অর্জন। হিরোশিমা ও নাগাসাকি এই আদর্শেরই দুই বলি। চিন্তা করার বা চিন্তা করতে না দেওয়ার ফলে তাবৎ সভ্য দেশের অধিকাংশ লোক 'কর্তার ইচ্ছার কর্ম' বলে একে মেনে নিয়েছেন।

নিজে চিন্তা না করার সব চেয়ে বড় কুফল হচ্ছে সত্য মিথ্যা যে-কোন কথা ও প্রচারণাকে বিশ্বাস করে বসা, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন লোকের স্বার্থমূলক কথাকেও বেদবাক্য মনে করা। একনায়ক ও ডিক্টেটরেরা চিরকাল এ করে এসেছে—স্বাধীন চিন্তাকে তারা মনে করে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং তাদের সব চেয়ে বড় শত্রু। ক্ষমতার ঐ এক ধর্ম—ক্ষমতা সব সময় মাথার চেয়ে হাতের উপর আর হাতের থেকেও হাতের ডাণ্ডার উপর নির্ভর করে বেশী। এই ডাণ্ডার ভয়েই লোকে তাদের মিথ্যাকেও সত্য বলে মেনে নেয়। মেনে নেয় দিনকে রাত ও রাতকে দিন বলে। এজন্যই বোধ করি, ক্ষমতাসীন লোক সম্বন্ধে জালাল উদ্দিন রুমী এই মন্তব্য করেছেন: "এরা মানুষের কাঁধে বাহিত শবের মতো, আত্মার বিনিময়ে এরা ক্ষমতা লাভ করে গর্ববোধ করে।" যে মানুষ কিছুটা ভাবে, করে চিন্তার চর্চা, তার কাছে এরা যে খড়ের দেবতা তা ধরা পড়তে দেরী লাগেনা। তাই জনসাধারণ বুদ্ধির চর্চা করুক, মাথা খাটাক এ ক্ষমতাসীন লোকেরা

মোটেও চায় না। আর যান্ত্রিক সুখ-সুবিধায় অভ্যস্ত মানুষও মাথা খাটাবার কষ্ট স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। তাই আজ সর্বত্র চিন্তার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বন্ধ্যাত্ব, মানুষ হয়ে পড়েছে গতানুগতিক, হারিয়ে বসেছে সত্যের প্রতি সব রকম অনুরাগ। মানুষের জীবনে সত্য ও ন্যায়ের যে কোন মূল্য আছে মানুষের মন থেকে সে বোধও আজ নিশ্চিহ্ন। যন্ত্র-জগতের যেমন দিনে দিনে, ঘন্টায় ঘন্টায় বদল হচ্ছে—মানুষের মত, বিশ্বাস আর ধারণাও তেমনি দিনে দিনে ও ঘন্টায় ঘন্টায় পাল্টাচ্ছে। কোন মত বিশ্বাসই আজ মানুষের মনে দানা বাঁধতে পারছে না। আজ সভ্যতার এই এক শোচনীয় দশা। এ অবস্থায় কোন বড় ও উচ্চ জীবনদর্শন আশা করাই যায় না। আশা করা যায় না কোন মহৎ শিল্প সাহিত্যও। রম্য রচনার সংখ্যা বৃদ্ধির এও এক বড় কারণ। বিগত সভ্যতা—যা মহৎ শিল্প সাহিত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, এমন কি রেনেসাঁ ও এনসাইক্লোপিডিস্টদের যুগের দিকে তাকালেও আমরা বুঝতে পারবো, মত-বিশ্বাস-আদর্শ-নিষ্ঠা, যা চিন্তা চর্চারই ফল—সভ্যতার স্থিতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য কতখানি আবশ্যক। আধুনিক সভ্যতার পায়ের তলায় এই অত্যাবশ্যক শর্তগুলি অনুপস্থিত। ফলে আজ সভ্যতার ত্রিশঙ্কু দশা।

বর্তমান সভ্যতা কোন গভীর ভাব ও চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে, ক্রমবর্ধমান এত উন্নতি সত্ত্বেও পদে পদে ট্র্যাজিক পরিণতির হাত থেকে তা রেহাই পাচ্ছে না। আজ এই মহাসংকটের দিনে বাঁচতে হলে মানব-সভ্যতাকে একটা নীতি ও সত্যের উপর দাঁড় করাতে হবে। আর তা করাতে হলে মানুষকে ভাবতে হবে, করতে হবে চিন্তা ও যুক্তির চর্চা, হতে হবে বিবেকী।

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র বিশেষজ্ঞ নই। বলাবাহুল্য বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা আমার পেশা আর ঐ সাহিত্যের চর্চা যে আমার নেশা, তা আমার বন্ধুদের অজানা নয়। তবুও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও আমি বিশেষজ্ঞ এই দাবিও আমার পক্ষে অগ্রাহ্য ও অশোভন। সাহিত্যের তবুও একটা সুনির্দিষ্ট সীমানা আছে, তার নীতি ও ধর্ম অন্তত শিক্ষিত সমাজের জানা ও পরিচিত। তাই শিক্ষিত জনের সামনে সাহিত্যালাপ করা সহজ ও তাকে করা যায় বোধগম্য। কিন্তু সংস্কৃতি সম্বন্ধে কি এ কথা বলা যায়?

সংস্কৃতি শব্দটি চল্‌তিও নয়, লৌকিকও নয়, ফলে তার সঙ্গে আছে আমাদের জনসাধারণের অপরিচয়। আমরা শিক্ষিতরা ঐ শব্দটি ইংরেজী culture শব্দের অনুবাদ হিসাবেই গ্রহণ ও ব্যবহার করছি। বলা যায় অপব্যবহার করছি সব চেয়ে বেশী। দেশে-বিদেশে এই শব্দের ব্যাপক অপব্যবহার কার না আজ লক্ষ্যগোচর? সংস্কৃতি কি, তার অর্থের গভীরতা ও পরিধি উপলব্ধি অধিকাংশ লোক করে না বলেই তার অপব্যবহার আজ এমন অবাধ ও সহজ হয়েছে। আমাদের চোখের সাম্‌নে দু'দুটা প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ ঘটে গেল, এ দুই মহাযুদ্ধে দুই বিপরীত পক্ষ তাদের যুদ্ধনীতির সমর্থনে দোহাই পেড়েছেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির। ব্যাপক ও বেপরওয়াভাবে শুধু যুদ্ধক্ষেত্র বা সৈন্যবাহিনীর উপর নয়, জনবহুল ঘুমন্ত নগরীর উপর অকাতরে বর্ষিত হয়েছে মারাত্মক শেল, বোমা ও এটমবোম্, দু'পক্ষের মেসিনগানের গুলী থেকে রেহাই পায়নি নিরীহ শিশু ও নারী, বৃদ্ধ ও রুগ্ন। এ সবই হয়েছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে। আমাদের দেশেরও অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে যে নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে তারও পেছনে সক্রিয় প্রেরণা জুগিয়েছে ধর্মের নাম ও সংস্কৃতির সঙ্কট। ইউরোপ, আমেরিকা রাষ্ট্রকে সংস্কৃতি আর আমাদের দেশ সংস্কারকে সংস্কৃতি ধরে নিয়ে নিজেদের

পশু-মানসের সমথন খুঁজেছে ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আড়াল। আমার মতে সংস্কৃতির, সত্যিকার সংস্কৃতির কোন ধর্মগত বা দেশগত রূপ হতেই পারে না, নাম আরোপও তেমনি শব্দের অপব্যবহার ছাড়া কিছুই নয়। ইউরোপীয় সংস্কৃতির কথা যখন আমারা বলি তখন আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে ইউরোপের রাষ্ট্ররূপ, সেখানকার দেশাচার ও সংস্কার, তেমনি হিন্দু বা মুসলিম সংস্কৃতির কথা যখন বলি তখনো আমাদের চোখের সামনে তাঁদের সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও সংস্কারের ছবিই আমরা দেখ্‌তে পাই। ধুতি-চাদর পরা হিন্দু সংস্কৃতি নয়, কোন কোন হিন্দুর দেশাচার বলা যেতে পারে, আচকান-পায়জামা পরাও তে্মনি মুসলিম সংস্কৃতি নয়। কোট প্যান্ট হ্যাট্ পরাও খৃষ্টান বা ইউরোপীয় সংস্কৃতি নয়। এই সবই আচার—ব্যক্তিগত বা দেশগত, কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মগত। তে্মনি দাড়ি রাখাও মুসলিম সংস্কৃতি নয়, তা যদি হত তা হলে পাকিস্তান মন্ত্রীসভার অধিকাংশকেই মুসলিম সংস্কৃতির দুষমন বল্‌তে হতো (বলাবাহুল্য ধর্মীয় বিধান ও সংস্কৃতি এক কথা নয়)। শেভ্ করাও খৃষ্টান বা ইউরোপীয় সংস্কৃতি নয়, তা হলে রাজা পঞ্চম জর্জ ও সপ্তম এডওয়ার্ড ও খৃষ্টান পাদ্রিগণ ইউরোপীয় সভ্যতার শত্রুরূপেই গণ্য হতেন। যদি বলা হয় লোকটি খুব cultured বা সংস্কৃতিবান তা হলে কারো মনে এমন কথা কি জাগে যে ক হচ্ছে হিন্দু, বা মুসলমান বা খৃষ্টান, বা ক পরে হ্যাট্ কোট্ বা আচকান-পাজামা বা ধুতি-চাদর? বা ক মাংসাশী কি নিরামিষভোজী? অথবা ক যায় মসজিদে, কি মন্দিরে অথবা গীর্জায়? বা ক হচ্ছে বি.এ. পাস কি এম. এ. পাশ? কখ্‌খনো নয়। তা হলে বুঝতে হবে যে সব দেশগত বা রাষ্ট্রগত বা ধর্মগত বা সম্প্রদায় ও দলগত আচার-ব্যবহার, মতামত ও রীতি-নীতিকে আমরা সংস্কৃতি বলে পরিচয় দিয়ে নিজদের কার্যকলাপের সমর্থন খুঁজি, তা আসলে সংস্কৃতি নয়। তা যদি হত তবে উত্তম হ্যাট্ কোট্‌ধারী বা দামী শেরওয়ানী পরুয়া বা মূল্যবান গরদের ধুতি-চাদর পরিধানকারী কখনো বর্বরের মত আচরণ করত না এবং এম. এ. বা পিএইচ. ডি. ডিগ্রীধারী কখনও করত না অসভ্যের মত ব্যবহার। তাই আমাদের বক্তব্য রাষ্ট্র বা সংস্কার যেমন সংস্কৃতি নয়, তেমনি প্রচলিত ধর্মীয় আচার বা শিক্ষাও সংস্কৃতি নয়। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে অসভ্যের দেখা মিলবে না এবং অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত লোককেও নেহাৎ পাষণ্ডের মত ব্যবহার করতে কে না দেখেছে? কাজেই ইসলাম, হিন্দু, খৃষ্টান বা অন্য যে কোন ধর্মগ্রহণ করেও লোক uncultured থাকতে

পারে, তেমনি এম. এ, পাস করে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোন উচ্চতম ডিগ্রী নিয়েও uncultured থাকা অসম্ভব নয়।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা কি জিনিস তা না জেনেই আমরা বিশেষ বিশেষ সভ্যতার প্রতি আগ্রহ ও পক্ষপাত দেখিয়ে থাকি। এই ভাবে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় বলেই আমরা সংস্কৃতির আসল স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না। সংস্কৃতির প্রতি যাঁর সত্যিকার দরদ রয়েছে, তিনি কখনও সংস্কৃতির নামে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন না। যদি কেউ এরকম করেন তিনি কখনও cultured বা সংস্কৃতিবান নন্।

কেউ কেউ পরাধীনতাকে সংস্কৃতির অন্তরায় বলেছেন কিন্তু তা যদি সত্য হত তা হলে স্বাধীন দেশের অন্তত অধিকাংশ নাগরিক হত সুসভ্য আর পরাধীন দেশে সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান লোকের আবির্ভাব আদৌ ঘটত না। সংস্কৃতির সঙ্গে যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন যোগাযোগ থাকত, তা হলে স্বাধীন ইউরোপ বা স্বাধীন জাপানের পক্ষে যুদ্ধের নামে এমন অমানুষিক বর্বরতার আশ্রয় গ্রহণ কি সম্ভব হত? আর এই পৌনে দুশো বৎসর ব্যাপী সুকঠোর ব্রিটিশ পরাধীনতার মধ্যে পাক-ভারতে কি বহু সংস্কৃতিবান বা cultured লোকের আবির্ভাব ঘটেনি?

তবে স্বাধীনতা যে সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক জীবনের সহায়ক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপরিহার্য। কারণ সভ্যতা বা সংস্কৃতি সৃষ্টি করে ব্যক্তি আর রুচিবান সুন্দরচিত্ত মানুষেরই প্রভাবে গড়ে উঠে সংস্কৃতি। রুচি বিশেষ করে সুরুচি ব্যক্তি-স্বাধীনতার ছায়াতলেই হয় বিকশিত। রাষ্ট্রের কাজ নিরাপত্তা ও অবসর সৃষ্টি করা, সেই নিরাপত্তা ও অবসরের ব্যবহার মানুষ কি ভাবে করবে তা নির্ধারণের ভার রাষ্ট্রের নয় মানুষেরই উপর। আর বাঁচার সংস্থান যাদের আছে তারাই করতে পারে সংস্কৃতির চর্চা, বেঁচে থাকাটা মানুষের প্রথমিক ও আদিম দায়িত্ব। এই দায়িত্বের ভার কিন্তু একান্তভাবেই স্বাধীন রাষ্ট্রের। নাগরিকদের খাওয়া-পরা ও নিরাপত্তার ভার যে-কোন রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। আমাদের রাষ্ট্র এই দায়িত্ব এখনো পুরোপুরি পালন করছে না বলেই আমাদের দেশে সংস্কৃতি-চর্চা নিষ্ফল ও বিড়ম্বিত হচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তিমনের উৎকর্ষের উপরই নির্ভর করছে

সংস্কৃতি, এখানে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলে ফল বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। মনের চর্চা ও উৎকর্ষের দ্বারা ব্যক্তিমানস গড়ে ওঠে ; তাই ব্যক্তির জীবন-দর্শন, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্তভাবেই তার নিজস্ব। এই ব্যক্তি-মানসের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করছে তাঁর সাংস্কৃতিক জীবনের মান। তাই আমার কাছে শিক্ষা, সভ্যতা বা সংস্কৃতি বড় কথা নয়, বড় কথা সুশিক্ষা, সুসভ্যতা ও সুসংস্কৃতি। সব দেশে কোন-না-কোন ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, আর আছে তথাকথিত সভ্যতা বা সংস্কৃতি—ইউরোপীয় সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, চীনা সভ্যতা, আরবীয় সভ্যতা ইত্যাদি সভ্যতার কত নামই ত প্রচলিত আছে। তবুও সুশিক্ষিত ও যথার্থ cultured বা সংস্কৃতিবান লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে কত নগণ্য! স্কুল কলেজ অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতিবান করতে পারে না। সংস্কৃতি-বিষয়ক বহু বিষয় অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় কিন্তু সংস্কৃতিবান বা cultured হওয়া যায় না। সভ্যতার যুগ মৌলিক সৃষ্টির যুগ না হলেও বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু গ্রহণ ও সমঝদারি ছাড়া সভ্যতা বা সংস্কৃতির জন্ম হতেই পারে না।

কতিপয়ের সৃষ্ট বিষয় যখন অনেকের উপভোগের ব্যাপার হয়, অতীত ও বর্তমানের উৎকৃষ্ট বস্তুগুলি যখন মানুষ সাগ্রহে গ্রহণ করে ও তার উপযুক্ত মূল্য দেয়, তখনই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। তাই সংস্কৃতির জন্য প্রতিভার চেয়ে সমঝদারি বেশী দরকার, এই সমঝদারির ফলেই ব্যক্তির স্বভাব ও চরিত্রে আলোক ও মাধুর্যের বিকিরণ ঘটে। সংস্কৃতিবান বা cultured হওয়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথের মত কবি-প্রতিভার অধিকারী না হলেও চলে ; কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমঝদারি করে ও তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও বাণীকে গ্রহণ ও হজম করে cultured বা সংস্কৃতিবান হওয়া যায়। সব বড় সৃষ্টি সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায়। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও ধার্মিকের সৃষ্টিকে হজম করেই সংস্কৃতিকে করা যায় আয়ত্ত ; এবং একমাত্র এ ভাবেই হওয়া যায় সংস্কৃতিবান। সমঝদারি মানে সুশোভন ও আনন্দিত জীবনের জন্যে প্রস্তুতি—প্রকৃত মূল্যবোধ ও যুক্তি বিচার তার সহায়। শিল্প বা কাব্যসৃষ্টি অনেক সময় প্রাকৃতিক ব্যাপার কিন্তু সুশিক্ষা বা আত্মসৃষ্টি প্রাকৃতিক ব্যাপার, নয়, তা সচেতন সাধনারই বিষয়। এই সচেতন সাধনাই সুসংস্কৃতির বুনিয়াদ।

দুঃখের বিষয় এ যুগে এই গ্রহণশীলতা বা সমঝদারি হচ্ছে পদে পদে

উপেক্ষিত। সমঝদারি ও গ্রহণের জন্যে চাই আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা, আজ আমাদের জীবনে সে প্রীতি ও শ্রদ্ধারই অভাব। তাই আজ আমাদের জীবনে সংস্কৃতি-সঙ্কট এমন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের সাধনাই সংস্কৃতি, তার জন্যে সংস্থান, অবসর ও নিরাপত্তার যেমন দরকার, প্রীতি ও শ্রদ্ধার আরো বেশী। আজ নানা কারণে আমাদের জীবনে স্থূল প্রয়োজনের তাগিদ সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, ইউরোপের দেখাদেখি তাই গতি হয়েছে আমাদেরও চরম আদর্শ এবং সৌন্দর্য-চর্চা ও মহত্ত্বের সাধনা পাচ্ছে পদে পদে বাধা। তাই বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে লিখেছেন : “এখন ব্যস্ত লোকেরা ধমক দিয়ে বলে, রেখে দাও তোমার সুন্দর, সুন্দর পুরোনো, সুন্দর সেকেলে। স্বল্পায়ু ফ্যাসান হঠাৎ-নবাবের মত উদ্ধত—তার প্রধান অহংকার এই যে সে অধুনাতম অর্থাৎ তার বড়াই গুণ নিয়ে নয়, কাল নিয়ে।” সত্যিকার সাহিত্য যেমন কালাকালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, সত্যিকার সংস্কৃতিও দেশ কাল বা সামাজিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সৌন্দর্য ও মহত্ত্বকে দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে ফেলে বিচার করবে? প্রকৃত মূল্যবোধ যাঁর আছে তাঁর কাছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সত্যপালন ও বিংশ শতাব্দীর সত্যপালন সমান মর্যাদারই অধিকারী। ঐতিহাসিক পরিচয়ের খাতিরে তাজমহলকে মোগল সংস্কৃতির একটি নিদর্শন বলে উল্লেখ করা যায়। তবুও সব দেশে সব যুগের মানুষের পক্ষে তার সৌন্দর্য উপলব্ধি আটকায় না। প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে না পারলে তা পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মতই জীবনের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনাকে দলিত মথিত করে দেয়। ফলে প্রয়োজন হয়ে উঠে জীবন, তখন মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য-চর্চাকে মনে হয় বিলাস। তাই দেখা যায় হাজার টাকা মাইনের কর্মচারীও নেয় ঘুষ ও সারা বৎসরে কেনে না একটি বই ও রাখে না খবর সাহিত্য ও শিল্পের। নিছক বেঁচে থাকা বা বাঁচার উপকরণটা যখন বড় হয়ে ওঠে তখন জীবন হয় সঙ্কীর্ণ ও দরিদ্র, বাঁচার উদ্দেশ্যটা বড় হয়ে উঠলেই জীবন হয় সুন্দর ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত। মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনাকে যাঁরা ফাঁকা বিলাস বলে বিদ্রূপ করেন তাঁরা ভুলে যান যে এ বিলাসই সভ্যতা বা সংস্কৃতি। প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তাজমহল বা অজন্তা বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও তাই হচ্ছে মানুষের সংস্কৃতি সাধনার নিদর্শন। তাজমহল নির্মাণের বিপুল ব্যয়কে অপব্যয় মনে করেন নি বলেই তাজমহলে শাজাহানের সংস্কৃতিবোধ পেয়েছে অমরত্ব। হাজার টাকা মাইনের চাকুরে বই কেনাকে মনে করেন অপব্যয় কিন্তু ব্যয়

সঙ্কোচ ও কৃপণতা করে জীবন বীমার সংখ্যাকে তিনি হাজারের সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে যান লাখের সীমায়। কিন্তু সংস্কৃতি-বোধ আছে অর্থাৎ নিজের মনের চর্চা অব্যাহত রাখতে চান তেমন পঞ্চাশ টাকার কেরানীও বই কিনতে না পারলে যৌথ পাঠাগারের সভ্য হয়ে নিজের সংস্কৃতি-চেতনাকে সজাগ রাখেন ও এ ভাবে মনের উৎকর্ষ সাধন করে তৃপ্তি পেয়ে থাকেন—এমন দৃষ্টান্ত এ দুর্দিনেওবিরল নয়।

জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করতে ত্যাগের প্রয়োজন, ত্যাগ বর্জন নয়, বরং বড় কিছুকে পাওয়া ও চাওয়ারই প্রমাণ বহন করে ত্যাগ। ফুল ফলে পরিণত হয় তার পাপড়ি ঝরিয়ে দিয়ে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্যও এ ধরনের ত্যাগের প্রয়োজন। শুধু আর্থিক, বৈষয়িক ও আরাম আয়াসে ত্যাগ যে দরকার তা নয়, সঙ্কীর্ণ দেশাচার ও সাম্প্রদায়িক সংস্কার ও তার মোহ ত্যাগ করতে না পারলেও প্রকৃত সংস্কৃতি-সাধক হওয়া যায় না। তা পারি না বলেই আমরা হিন্দু সংস্কৃতির ও মুসলিম সংস্কৃতির নামে উত্তেজিত হয়ে উঠি।

উৎকট বিশ্বাস ও অন্ধভাবাবেগ হচ্ছে সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তরায়। যে কোন উৎকট ভাব মানুষের বুদ্ধি ও মনকে করে রাখে সম্মোহিত ও আচ্ছন্ন। বিপ্লব ও আন্দোলন জাতীয় জীবনে নিয়ে আসে ঝড় ও ভূমি-কম্পের প্রচণ্ডতা, তখন কারো মন থাকে না সুস্থ ও দৃষ্টি থাকে না স্বচ্ছ। ফলে তখন সংস্কৃতি থেকে সংস্কার হয়ে ওঠে বড়। এই সংস্কারই জাতীয়, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের লেবেল্ এঁটে বাধায় বিরোধ, ফলে সমাজ বা সম্প্রদায় হয়ে পড়ে এককেন্দ্রিক। আত্মকেন্দ্রিকতার অপর নাম হচ্ছে কূপমণ্ডুকতা। এতদিন আমরা ছিলাম পরাধীন। এই পরাধীনতার কাল নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে ছিল দুর্দিন, দুর্দিনে দিশেহারা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে মনে রাখতে হবে দুর্দিনে যে কথাটি বড় হয়ে ওঠে সেটিই বড় সত্য নয়, সুদিনে যে কথাটি বড় হয়ে ওঠে সেটিই বড় কথা। দুর্দিনের উত্তেজনার মুহূর্তে ভাইকে যে আঘাত দিয়েছি এটা জীবনের বড় বা ছোট কোন সম্পদই নয়, বড়জোর তা আত্মবিস্মৃতিরই স্মারক। সুদিনে স্বাভাবিক অবস্থায় সুস্থ চিত্তে ভাইকে যে ভালবেসেছি এটি বড় কথা এবং এইটেই জীবনের সম্পদ।

আজ আমাদের জীবন থেকে পরাধীনতার দুর্দিন গত হয়েছে, আমরা স্বাধীন ও আজাদ হয়েছি। আশা করি আজ অন্তত দুর্দিনের দুঃস্বপ্ন কেটে

যাবে এবং সুদিনের দর্শন অর্থাৎ মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনা যার অপর নাম সংস্কৃতি তা বড় হয়ে উঠবে। আজ আমরা সুস্থ ও স্বাভাবিক চিত্তে ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে পারব। ঘরের প্রয়োজন আমাদের নিশ্চয়ই আছে এবং চিরকাল থাক্‌বে ; কিন্তু ঘর যেন কবর হয়ে না ওঠে অর্থাৎ ঘর যেন ঘরের থেকেও বড় পৃথিবী ও আকাশকে আমাদের মন ও চোখ থেকে রুদ্ধ করে না রাখে। ঘরে বসে আমরা যেন বিশ্বের সঙ্গে বাণী বিনিময় করতে পারি। বলেছি মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনাই সংস্কৃতি, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের নেই কোন সীমা, তা আকাশেরই মত অসীম। মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনার উপর এক কথায় মনুষ্যত্বের উপর যে সংস্কৃতির ভিত্তি, একমাত্র সেই সংস্কৃতিই মানবজীবনে বিকিরণ করতে পারে আলো। যে আলোর নেই কোন দেশ, কোন কাল ও কোন জাত।

সংস্কৃতি ও সজ্জীবন আমার কাছে একার্থবোধক। cultured লোক বল্লে আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠে এমন লোকের ছবি যিনি সজ্জীবনের অধিকারী। সজ্জীবন বা good life-কে বাদ দিয়ে কোন সংস্কৃতিরই আমি ধারণা করতে পারি না এবং সে রকম সংস্কৃতি আমার কাছে কিছুমাত্র শ্রদ্ধার বস্তু নয়।

Clive Bell সাহেব তাঁর Civilization গ্রন্থে একটি চমৎকার সত্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন : "The civilized man is made not born." সংস্কৃতি কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, সংস্কৃতি নিয়ে কেউই জন্মায় না এবং কেউ তা পেতে পারে না উত্তরাধিকার সূত্রে। প্রতিদিন সচেতন সাধনার দ্বারা সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করতে হয়! এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ সহজলভ্য হবে তাঁর যিনি পরিচালিত হবেন যুক্তি, বিচার ও শুভবুদ্ধির দ্বারা। জীবনে বুদ্ধি ও বিচারের আসন সুদূর-প্রসারী। কিন্তু বুদ্ধি ও বিচারশক্তির প্রয়োগ করতে হবে জীবন-সাধনায়, মানুষের জন্য জীবনই সব চেয়ে বড়। ব্যক্তি নয়, জাতি নয়—জীবন। এই জীবনসাধকই হতে পারেন প্রকৃত সংস্কৃতিবান বা cultured, তাই সমঝদার ঐতিহাসিক হযরত মুহম্মদকে বলেছেন জীবনসাধক, আর রসগ্রাহী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিয়েছেন জীবন-শিল্পী বলে।

মোটকথা, মনুষ্যত্ব তথা মানব-ধর্মের সাধনাই সংস্কৃতি এবং একমাত্র এ সাধনাই জীবনকে করতে পারে সুন্দর ও সুস্থ।

আগামী দিনের সভ্যতাঃ একটি কল্পনা

I love God, because, He has given me the
freedom to deny Him.
—*Rabindranath Tagore*

Lord, I disbelieve—help thou my unbelief.
—*E. M. Forster*

ক

মানবজাতির পরম শত্রু শয়তান সম্বন্ধে খাস আরব জগতের অন্তর্গত লেবাননের বিখ্যাত আরবী লেখক খলিল জিব্রান (১৮৮৩—১৯৩১) একটি চমৎকার গল্প লিখেছেন। বলা বাহুল্য জিব্রান জাতে আরব ও ধর্মে খৃষ্টান ছিলেন আর লিখতেন তাঁর মাতৃভাষা আরবীতে। তাঁর গল্পটির প্রাথমিক অংশটুকুই এখানে উদ্ধৃত হলোঃ একদিন এক পাদ্রী সাহেব জনহীন এক প্রান্তরের উপর দিয়ে একা একা বাড়ী ফিরছিলেন। হঠাৎ এক করুণ আর্তনাদ তাঁর কানে ভেসে এল। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন কে একজন রাস্তার পাশের খাদে আহত অবস্থায় পড়ে আছে, সারা অঙ্গে তার ক্ষত চিহ্ন। মাথা আর বুকের ক্ষতস্থান থেকে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। পাদ্রীকে দেখতে পেয়ে লোকটি কাতর কণ্ঠে বলে উঠলঃ দয়া করে আমাকে বাঁচান, যন্ত্রণায় আমি মারা যাচ্ছি, দোহাই, আমার প্রতি একটুখানি সদয় হোন।

পাদ্রী সাহেব ধাঁধায় পড়লেন। লোকটি কে হতে পারে? ভাবলেন হয়ত চোর ডাকাতই হবে। ধরা পড়ে বেদম মার খেয়েছে। এমন লোককে সাহায্য করতে গেলে নিজেই না জানি কি বিপদে পড়ে যাই। যদি বেঁচে উঠে ত লোকে বলবে আমি বোধ করি চোরের সাথী আর মরে ত বলবে আমিই ওকে খুন করেছি। বাবা অত হ্যাঙ্গামে গিয়ে কাজ নেই। এ ভেবে

পাদ্রী সাহেব সামনে পা বাড়ালেন। মুমূর্ষু লোকটি আবারও আর্তনাদ করে উঠলো: দোহাই, আমাকে এ ভাবে ফেলে যাবেন না স্যার। আমি মারা যাচ্ছি, দয়া করে আমাকে বাঁচান।

পাদ্রী সাহেবের মনে দ্বিধা জাগল: আর্তের সাহায্য না করাও ত অন্যায়। লোকটি পাগল-টাগলও ত হতে পারে, পাগলামি করতে গিয়েই হয়ত পড়ে গেছে খাদে। উঃ ক্ষতস্থান থেকে এখনো যে ভাবে রক্ত ঝরছে দেখলেই ত ভয় হয়। তবে আমি হচ্ছি আধ্যাত্মিক অসুখ-বিসুখের চিকিৎসক, দেহের ক্ষত আমি কি করে সারাবো?

ফের পা বাড়ালেন তিনি নিজের গন্তব্য পথের দিকে।

দেখে আহত লোকটি আরো জোরে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল: আমাকে চিনতে পারলেন না, স্যার? কাছে এলে হয়ত চিনতে পারবেন। আমরা ত দীর্ঘকালের সহকর্মী, বন্ধুও বলা যায়। আপনি পাদ্রী, লোকের পথপ্রদর্শক, মানুষের উদ্ধারকর্তা। আর আমাকে এ সামান্য দয়াটুকুও করতে আপনার ইচ্ছা হচ্ছে না, স্যার? আমি চোর নই, ডাকু নই, পাগল-ছাগলও নই। আর একটু কাছে এসে দাঁড়ান, স্যার, আমার পরিচয়টা না হয় বলেই ফেলি। এবার পাদ্রী সাহেবের কৌতূহল গেল বেড়ে, এগিয়ে এসে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন লোকটার মুখের দিকে। লোকটির কেমন এক অদ্ভুত চেহারা, বুদ্ধির সঙ্গে ধূর্ততার, সৌন্দর্যের সঙ্গে বীভৎসতার, দুষ্টুমির সঙ্গে কোমলতার সে এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। এমন চেহারা পাদ্রী এর আগে আর কখনও দেখেন নি, বিস্মিত পাদ্রী জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কে? মুমূর্ষু লোকটি ক্ষীণকণ্ঠে বল্লে: আমাকে ভয় পাবেন না, স্যার। আসলে আপনি আর আমি বহুকালের পুরোনো দোস্ত। আমাকে ধরে একটুখানি নদীর ধারে নিয়ে চলুন, ক্ষতস্থানগুলি ধুয়ে একটু বেঁধে দিন। অন্তত রক্ত পড়াটা ত বন্ধ হোক।

পাদ্রীর বিস্ময়ের ঘোর যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। বল্লেন: আগে বল তুমি কে? আমি ত তোমাকে মোটেও চিনতে পারছি না। কোনদিন তোমাকে দেখেছি বলেও ত মনে পড়ে না। আহত লোকটি এবার অস্থির কণ্ঠে বলে উঠল: আমার পরিচয়, স্যার, আপনি ভালো করেই জানেন,

দিনে আপনি হাজার বার নিয়ে থাকেন আমার নাম। ধরতে গেলে আমি আপনার প্রাণের চেয়েও প্রিয়......।

পাদ্রী সাহেব এবার আর ধৈর্য রক্ষা করতে পারলেন না। ধমকে উঠলেন : তুমি একটা আস্ত জোচ্চোর, ডাহা মিথ্যেবাদী, বলছি তোমার এপাপ মুখ আমি জীবনে কখনও দেখিনি, তবুও। যাগ্‌গে যদি বাঁচতে চাও তা হলে খুলে বলো তুমি কে?

মুমূর্ষু লোকটি এবার মরীয়া হয়ে আর একটু সরে এলো পাদ্রীর দিকে। ভালো করে তাকিয়ে দেখল পাদ্রীর দুই চোখের পানে। দেখতে দেখতে ওর বিষণ্ণ মুখে ফুটে উঠল এক বাঁকা ব্যঙ্গ-হাসি। তারপর স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বল্লে : আমি শয়তান।

ধর্ম-ভীরু পাদ্রী শুনেই আঁৎকে উঠলেন। হায় হায় কি গজব! কি গজব! আমাকে কিনা আজ তোমার নারকীয় মুখ দেখতে হল। চির অভিশপ্ত তুমি মর, মর। মরে জাহান্নামে যাও।

বলতে বলতে হন্ হন্ করে পাদ্রী সাহেব হাঁটা শরু করলেন সামনের দিকে।

নাছোড়বান্দা শয়তান আবারও কাতর কণ্ঠে বলে উঠল : দোহাই আমাকে এ ভাবে ফেলে যাবেন না, স্যার। আমাকে বাঁচান, শিগ্‌গির আমার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করুন।

অগ্নি-দৃষ্টি হেনে পাদ্রী রুষ্টস্বরে বল্লেন : যে হাতে রোজ রোজ আমি ঈশ্বরের তর্পণ করে থাকি সে হাত আমি কিছুতেই তোমার না-পাক দেহে লাগাতে পারবো না।

শয়তান এবার এক হাতের কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে রক্তসিক্ত মাথাটা সামান্য আলগা করে বল্লে : আপনি নিজের পায়েই নিজে কুড়াল মারছেন স্যার, অথচ তা বুঝতে পারছেন না। জানেন, আপনার সব রকম সুখ-শান্তির মূলে কিন্তু আমি। আর আপনি আমাকেই কিনা দিচ্ছেন অভিশাপ! আমার অস্তিত্বের উপর আপনার জীবন, ধন-দৌলত, সুখ-সমৃদ্ধি সব কিছুই ত নির্ভর করে। আর আপনি কিনা আজ আমার এ চরম দুর্দিনে আমার প্রতি সামান্য এ দয়াটুকু দেখাতেও নারাজ। আপনার জীবনধারণের

একমাত্র হাতিয়ার ত আমি, একমাত্র পুজি ত আমার নাম। আমার নাম ভাঙিয়েই ত আপনার যতসব হালুয়া-রুটি। আমি আছি বলেই ত আমার ভয় দেখিয়ে নিজের সব রকম তুক্‌তাকের সাফাই গাইতে পারেন সরল বিশ্বাসী মানুষের কাছে। আমার ভয় দেখিয়ে জীবনে কত ধন রোজগার করেছেন একবার ভেবে দেখুন দেখি। আমি মরে গেলে আপনাকেও কি স্রেফ উপোসে মরতে হবে না? আজ যদি আমার মৃত্যু ঘটে তা হলে কাল থেকে আপনিও কি সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যাবেন না? মনে রাখবেন দুনিয়া থেকে আমার নাম মুছে গেলে, নির্ঘাত আপনার পেশারও ঘটবে ভরাডুবি। কাল থেকে আপনার ঘরেও জ্বলবে স্রেফ লালবাতি। ভেবে দেখুন, সারা জীবন গ্রামে গ্রামে ঘুরে শয়তানের খপ্পরে না-পড়ার জন্য লোককে ইনিয়ে-বিনিয়ে কত উপদেশ খয়রাত করেছেন আপনি? বিনিময়ে গরীবের ক্ষেতের কত ফসল, কত ফলমূল, দুঃখের কত সন্ধ্যা, সোনাদানা আপনার ঘরে আপনার আলখাল্লার পকেটে আশ্রয় নিয়েছে একবার হিসেব করে দেখুন। আমি না থাকলে তাবিজ-মাদুলি আর ঝাড়-ফুঁকের জন্য কেই-বা আপনার দোর গোড়া মাড়াবে বলুন ত! গাঁয়ের লোকেরা যখন শুনবে তাদের পরম শত্রু শয়তান আর ইহজগতে নেই তখন তারা কি আপনার শরণাপন্ন হবে? তখন হাঁস-মুরগি আর ছাগল-দুম্বার কল্লাটা কি আর ওরা আপনার পাতে তুলে দিতে গরজ করবে বলুন? অতএব আমি মরলে শুধু যে আমি মরবো তা নয় আপনিও মরবেন এবং মরবেন ঝাড়ে-বংশে···।

শয়তানের এ সুচিন্তিত আর সারগর্ভ বক্তৃতা শোনার পর পাদ্রীর যেন মুহূর্তে জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেল। তখন বিনাবাক্যে তৎক্ষণাৎ তিনি আহত শয়তানের বিশাল দেহটা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। শয়তানের ক্ষত-স্থান থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্তে তাঁর সাদা ধবধবে লম্বা আলখাল্লাটা ভিজে ভিজে রক্তাক্ত হয়ে গেল। পাদ্রী সাহেবের সেদিকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। শয়তানের দেহ-ভারে তাঁর নিজের দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে পড়েছে। তবুও প্রাণপণে অত বড় দেহটা তিনি একাই বয়ে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ী এবং বেশ আলতোভাবে অতি প্রিয়জনের মতো শুইয়ে দিলেন নিজের সযত্নে-পাতা ধবধবে বিছানায়। তারপর স্বহস্তের সেবা-যত্নে শয়তানকে নিরাময় করে তুল্লেন অল্পদিনের মধ্যেই।

সেই থেকে আবার নব উৎসাহ ও নতুন উদ্যমে ঈশ্বর-ভক্ত পাদ্রী ও ঈশ্বর দ্রোহী শয়তান সহ-অংশীদার হয়ে সগৌরবে আর অতি সাফল্যের সাথে

নিজ নিজ পেশা চালিয়ে যাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তথা co-existence-এর এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি মিলবে কিনা সন্দেহ।

খ

ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু ঈশ্বর-ভক্ত পাদ্রীকে দেখতে পাই। তিনি এবং তাঁর অনুরূপ পেশার লোকেরা ঈশ্বরের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি। ঈশ্বরের বিপরীতে শয়তানকে না দাঁড় করালে চিত্রটা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাই ঈশ্বর-রূপী কল্প-মূর্তির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে বিপরীত কল্প-মূর্তি শয়তানের আবির্ভাবও অপরিহার্য। তবে জিজ্ঞাস্য: মানুষ কেন ঈশ্বর আর শয়তানে বিশ্বাস করে? যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে এযাবত কোন দার্শনিক ধর্মবেত্তাই এ জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। এসবের সপক্ষে এযাবত যত যুক্তিই দেওয়া হয়েছে তা সবই অনুমান, মন গড়া। কোনটাই প্রমাণ নয়। দণ্ড ও পুরস্কার-দাতা হিসেবে ঈশ্বরের যে ধারণা বা স্বর্গ-নরকের যে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় তাতে একটা প্রবল আকর্ষণ আর কৌতূহল জাগে বটে কিন্তু জিজ্ঞাসু মন তাতে তৃপ্তি কিম্বা সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। স্বর্গ-নরকের ভৌগোলিক, স্থানিক আর জৈবিক জীবনের যে চেহারা তা এত বেশী স্থূল আর গ্রাম্য যে তাতে রুচিশীল মনের তেমন উৎসাহ বোধ করার কথা নয়। হালে নানা শূন্যযান আবিষ্কার আর চন্দ্রে মানুষের অবতরণ ইত্যাদি অকল্পনীয় কাণ্ডের পর স্বর্গ-নরকের ভূগোল একদম গোল বা শূন্যে বিলীন, সে সঙ্গে মানুষের দীর্ঘকালের অনেক আস্থাও।

বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের ফলে আজ বুঝতে পারা যাচ্ছে একমাত্র মৃত্যুই সত্য, মৃত্যুই অমর। অর্থাৎ যমই চিরজীবী দেবতা। পূজা যদি কারও করতে হয় তাহলে একমাত্র যমরাজেরই করা উচিত। দেখা যায় একমাত্র মৃত্যুর সামনেই মানুষ ভীত আর অসহায়, তখনই সে খোঁজে কোন-না-কোন অবলম্বন আর সন্ধান করে আশ্রয়, হোক না তা সমুদ্রে ভাসমান তৃণখণ্ড। এর ফলেই বা এভাবেই মানুষের মনে জন্ম নেয় এক অশরীরী শক্তির উপর বিশ্বাস আর সে সঙ্গে আত্মসমর্পণের আকুতি। আজ যদি বিজ্ঞান এমন অঘটন ঘটাতে পারে, যার ফলে মানুষের জীবন থেকে মৃত্যু যাবে মুছে, মানুষ হতে পারবে নিশ্চিন্ত, 'শেষের সে ভয়ংকর দিনের' ভাবনা

থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তা হলে আমার বিশ্বাস কেউই ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে না, বিশ্বাস করার প্রয়োজনই তখন যাবে ফুরিয়ে। স্বর্গ-নরককেও রাখবে না এতটুকু আস্থা এবং শয়তানের ভয়েও হবে না মানুষ মোটেও ভীত। এযাবত বিজ্ঞান বহু অসাধ্য সাধনই ত করেছে, শত বছর আগে যা ছিল অকল্পনীয় তা আজ বাস্তবে রূপায়িত। তেমন আর এক অসাধ্য সাধন করে বিজ্ঞান যদি মানুষকে মৃত্যু জয় করার হদিস বাতাতে পারে তা হলে ঈশ্বর বা অনুরূপ কোন অশরীরী শক্তির প্রয়োজনই থাকবে না মানুষের জীবনে। বলা বাহুল্য মানুষ নিজের প্রয়োজনেই ঈশ্বরকে, লৌকিক ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে। স্রষ্টা কি ঈশ্বর না মানুষ এ নিয়ে রীতিমতো তর্ক চলতে পারে। যুগে যুগে জিজ্ঞাসু আর কৌতূহলীদের মনে এ তর্ক যে জাগেনি তা নয়। তবে এ তর্কের কোন মীমাংসা নেই। অন্তত যদ্দিন না মানুষ মৃত্যুকে আয়ত্তে আনতে পারছে। বলা বাহুল্য আধ্যাত্মিক চেতনায় যে ঈশ্বরের উপলব্ধি মানুষ কোন কোন দুর্লভ মুহূর্তে বা শোক-দুঃখের বিহ্বল অবস্থায় অনুভব করে, যা মহৎ মনের স্বভাবিক অনুষঙ্গ বলা যায়, সে ঈশ্বর বা তেমন ঈশ্বর-চেতনা আমাদের এ আলোচনার বহির্ভূত।

গ

জন্ম ও মৃত্যু—জীবনের দুই সীমা। জন্ম মানুষ জয় করেছে অর্থাৎ নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে সামাজিক ধর্মবোধে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। এ আবিষ্কারের আগে নরনারীর যৌন অপরাধের বিচার হতো দুই পৃথক মানদণ্ডে। এখন দুই মানদণ্ড এক হয়ে গেছে। গুরুত্বে দু'য়েরই অপরাধ সমান ভাবতে এখন আর কারও আপত্তি দেখা যায় না। বিজ্ঞান মানুষের নৈতিক-চেতনাকেও কিভাবে বদলে দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো বেশী করে যে দেবে এ বোধ করি তার এক বড় দৃষ্টান্ত। আসলে ধর্ম বা নীতি বড় কথা নয়, বড় কথা সমাজ বা মানুষের সামনে মুখরক্ষা। এ ভাবে বিজ্ঞান সমাজের অর্ধাংশকে মুখ রক্ষার সুযোগ দিয়ে অন্য অর্ধাংশের সঙ্গে এক করে দিয়েছে। অন্তত এ একটা ক্ষেত্রে নরনারীকে সমানাধিকার দিতে বিজ্ঞান সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানের এ অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের অন্য সীমা মৃত্যুকেও যদি বিজ্ঞান জয় করতে, অন্ততপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা হলে প্রচলিত

ধর্মের পনেরো আনাই অকেজো হয়ে যাবে। প্রচলিত ধর্মের মূল ভিৎ ঈশ্বর আর শয়তানের ভবিষ্যৎও এ জয়ের উপরই নির্ভর করছে। শুধু ঈশ্বর ও শয়তানের নয় সব রকম দেব-দেবী, ফেরেস্তা, হুর, গেলমান, স্বর্গ-নরক, পাপপুণ্য অনেক কিছুরই ভাগ্য নির্ভর করছে এ জয়ের উপর। নির্ভর করছে মোল্লা-মৌলবী, পাদ্রী-পুরোহিত, খাদেম-পাণ্ডা আর তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীর রুজি রোজগারও। তখন সমাজে কোন পাত্তা থাকবে না এ সব লোকের। পাপ–পুণ্যের ধারণা যাবে মুহূর্তে বদলে, যেমন বদলে গেছে যৌন অপরাধের বেলায়।

তখন কি মানুষ অমানুষ হয়ে যাবে ? নিশ্চয়ই না। নৈতিক-বোধ, কর্তব্য–জ্ঞান, ন্যায়-অন্যায় চেতনা অবশ্যই মানুষের থাকবে। শুধু থাকবে না বিদেহীজীবনে দণ্ড পুরস্কারের ভয় কিম্বা লোভ। বলা বাহুল্য মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি-চেতনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃতির উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না, করে নৈতিক ধারণা, সৌন্দর্য-চেতনা, দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান এবং সর্বোপরি জীবনের মূল্যবোধের উপর। এখন সে মূল্যবোধ অনেকক্ষেত্রে, বিশেষ করে যে সব দেশে ও যে সব সমাজে ঈশ্বরকে নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি চলে সেখানে, ভয়ানকভাবে উপেক্ষিত। লোক-দেখানো আনুষ্ঠানিক ধর্ম তথা ঈশ্বর স্বীকৃতির নামে নৈতিক চেতনা ও নৈতিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সেখানে অতি বেশী সহজ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ঈশ্বরকে মুখে স্বীকার করা বা মানা খুবই সহজ কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব পালন রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। মানুষ চিরকালই সহজের ভক্ত। তাই দেখা যায় সমাজিক ঈশ্বরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মূল্য অন্য দশটা লৌকিক ব্যাপারের চেয়ে বেশী নয়! ‘Beware of that man whose God is in heaven’—শ’এর এ উক্তি যথেষ্ট অর্থপূর্ণ। আকাশবিহারী ঈশ্বরই সমাজিক ঈশ্বর, যা আমরা উত্তারাধিকার সূত্রে ভিটে মাটির মতো পেয়ে থাকি।

কথায় বলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না। কারণ তিনি কারো মা নন্ পুরোপুরি। সামাজিক ঈশ্বরেরও সে দশা। সমাজকে দেখিয়ে দূর থেকে একটু নমো নমো করলেই চলে। অন্তর দিয়ে বোঝা কিম্বা উপলব্ধির দরকার পড়ে না। যে ঈশ্বর মানুষের চরিত্রে নৈতিক চেতনায় আর মূল্যবোধে রূপায়িত সে ঈশ্বরেরই যা কিছু মূল্য। ব্যক্তি-চেতনায় সজীব হয়ে মিশে থাকে থাকুক। ঈশ্বরই মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করে। বলা বাহুল্য

ঘ

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই জীবনদেবতা। ঘটা করে প্রতি বছর যারা রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করে, তাদের কারো নয়।

দুনিয়ায় অধিকাংশ মানুষেরই সাধ-স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। আশাভঙ্গের বেদনা বোধ করেনি বা করে না এমন মানুষ বিরল। এদের কাছে জীবন সহনীয় হয়েছে একমাত্র পরলোকে বিশ্বাসের জোরেই। এখানে তারা যা পায়নি সেখানে তা পাবে। এখানকার অপূর্ণ বাসনা-কামনা সেখানে গেলেই পূর্ণ হবে। এমনতরো বিশ্বাসে তারা যেন কিছুটা স্বস্তিবোধ করে। ইহজীবনে তারা যে অবিচার ভোগ করেছে—পরজীবনে তার সুবিচার পাবে। আর সুবিচার পেতে হলে একজন নিরাসক্ত নিক্তিধর সুবিচারক দণ্ডধর থাকা চাই। যে সমাজব্যবস্থা এখন কায়েম রয়েছে তাতে ওরা দেখতে পায় পৃথিবীটা প্রায় শয়তানেরই রাজ্য। এ শয়তানকে নরকে ফেলে আচ্ছা করে শায়েস্তা করতে না পারলে এদের মন কিছুতেই শান্তি পায় না। একজন সর্বশক্তিমান দণ্ডধর না হলে দণ্ড দেবে কে? তাই ঈশ্বরের নাম 'দণ্ডধর', ঈশ্বরের নাম 'বিচারক', ঈশ্বরের নাম 'পুরস্কারদাতা' ইত্যাদি। আশা অমর আশা অশেষ। আশা কুহকিনীই ঈশ্বরকে নানা রঙ্গে নানারূপে রূপায়িত করে তোলে। বলা বাহুল্য যুগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আশারও রূপ-বদল ঘটে। যে লোক একদিন জুড়ি গাড়ীর স্বপ্ন দেখত, সে এখন মটরের স্বপ্ন দেখে, অনেকে মটর ছাড়িয়ে এরোপ্লেনের। যে স্বর্গে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ী নেই, সিনেমা টেলিভিশন নেই, সিনেমা তারকারা থাকবে না, তেমন স্বর্গের প্রতি এ যুগের তরুণেরা তেমন আগ্রহ বোধ করবে বলে মনে হয় না। যুগের সঙ্গে সঙ্গে এ ভাবে স্বর্গ-নরকের ধারণা যেমন বদলে যাচ্ছে তেমনি আমার মনে হয় ঈশ্বর আর শয়তানের ধারণায়ও রদবদল ঘটছে; এবং না ঘটে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানতে হলে শয়তানের অস্তিত্বও মানতে হয়। এ প্রায় গণতন্ত্রের মতো ব্যাপার। গণতন্ত্রের ঈশ্বর যদি হন লীডার অব্ দি হাউস, শয়তান হচ্ছে লীডার অব্ দি অপজিশন। একে অন্যের পরিপূরক। শয়তান না থাকলে ঈশ্বরের প্রয়োজন ও নিঃশেষিত। ঈশ্বর মানে না এমন মানুষ কিম্বা সম্প্রদায়ের অভাব নেই কিন্তু শয়তান মানে না এমন লোক

বিরল। এমন কি আস্ত নাস্তিকও শয়তানে বিশ্বাস করে। শনি ত শয়তানেরই নামান্তর। আর শনিপূজাই ত একমাত্র সাপ্তাহিক পূজা! অপজিশন ছাড়া যেমন গণতন্ত্র অচল, তেমনি শয়তান ছাড়া ঈশ্বরতন্ত্র ও অচল অন্তত সৎশক্তি।

ঙ

মানুষের ভাগ্য, মানুষের ভবিষ্যৎ আর মানব সভ্যতার রূপান্তর সব কিছু নির্ভর করছে মৃত্যুকে আয়ত্তে আনার উপর। মৃত্যু থাকলে পরকালের ধারণা আর তাতে বিশ্বাসও একভাবে না একভাবে থাকবে। তেমন অবস্থায় ঈশ্বর আর শয়তানের ধারণাও অপরিহার্য। এ দুই বিপরীতমুখী শক্তির আয়ু নির্ভর করছে পরকালে দণ্ড পুরস্কারের আশা আর বিশ্বাসের উপর। মৃত্যু না থাকলে বা মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে পরকালও থাকবে না তখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব শুধু বিপন্ন নয়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গে শয়তানেরও একই দশা। সাথে সাথে মোল্লা-মৌলভী, পাদ্রী-পুরোহিতের পেশার দুয়ারেও পড়বে তালা। জন্ম-মৃত্যু জীবনের দুই তীর—দুই মেরু। এর একটাকে মানুষ জয় করেছে, অন্যটাকেও যদি জয় করতে পারা যায় তা হলে মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ চেহারাই যে শুধু বদলে যাবে তা নয়, অতীতের অনেক ধ্যান-ধারণা, ধর্মকর্ম, ক্রিয়া-কাণ্ড স্রেফ অর্থহীন হয়ে পড়বে। মনে হবে কি বিরাট অপচয়! বিয়ের পর মেয়েদের যেমন ছেলেবেলার পুতুল খেলাকে মনে হয়, যত সব ছেলেমানুষী কাণ্ড, আজকের ধর্মকর্মকেও সেদিন তাই মনে হবে। অনেক মহাপুরুষকে মহাপুরুষই আর মনে হবে না, মনে হবে স্রেফ ফাঁকি দিয়েই তাঁরা মানুষের পূজো আদায় করে নিয়েছেন এতকাল। হয়তো মহাপুরুষ কথাটারই মানে যাবে বদলে। আজকের এ দুই প্রাতঃস্মরণীয় নাম—ঈশ্বর আর শয়তান, সেদিন হয়ত পুরাতত্ত্বের সামিল হয়ে পড়বে এবং গবেষকদের থীসিসে ছাড়া এ দুটি নাম আর কোথাও পাওয়া যাবে না খুঁজে। শুধু শাস্ত্রগ্রন্থ নয়, অনেক কাব্য-কাহিনীও সেদিন অর্থ আর সব রকম আবেদন হারিয়ে বসবে। মনে হবে যত সব ভুতুড়ে কাহিনী। অতবড় দান্তেকে মনে হবে একদম ছেলেমানুষ। আমাদের রবীন্দ্রনাথও হয়তো আদ্ধেক হয়ে যাবেন। ভক্তিগদগদ অনেক গান কিম্বা কবিতা মনে হবে স্রেফ প্রলাপ।

বর্তমান সভ্যতা, তথাকথিত 'স্বাধীন বিশ্বে' যে সভ্যতা এখন চলতি তা মোটামুটি ধর্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ ঈশ্বর আর শয়তানের ধারণাকে কেন্দ্র করেই তা শাখায়িত ও পল্লবিত। সে দুটি যেদিন ভেঙে যাবে আনুষঙ্গিক অন্য সব কিছুও সেদিন লোপ না পেয়ে পারে না। তখনই হয়তো মানুষ হতে পারবে পুরোপুরি মুক্ত, তখনই শুধু মানুষের মন থেকে ঘুচবে যত সব অদৃশ্য আর অশরীরী বন্ধন, খসে পড়বে মুহূর্তে যুগযুগান্তরের যত সব সংস্কারের শিকল। সর্ব-বন্ধনমুক্ত সে মানুষের সভ্যতা নিশ্চয়ই ভিন্নতর হবে। ঈশ্বর-হীন, শয়তান-হীন সে সভ্যতার কল্পনাই ত রীতিমতো রোমাঞ্চকর! স্বর্গের লোভ নেই, নরকের ভয় নেই, নেই আর আজাবের আতংক; পীর-পুরোহিত, পাদ্রী-যাজক নির্মূল, মন্দির-মসজিদ, গীর্জা-মঠ, দরগা-মাজার আর সংখ্যাহীন তীর্থভূমি পুরাতত্ত্বে পরিণত। আর্কোলজিকেল বিভাগের সংরক্ষিত দর্শনীয় বস্তুর বাইরে যার আর কোন মূল্যই থাকবে না। তখন জেরুজালেম আর জাকার্তা, বৃন্দাবন আর বান্দরবনকে সমান ভাবতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না। থাকবে না তখন পূর্ব আর পশ্চিমে কোন ভেদ। রাম-রহিমকে জুদা না ভাবা তখনই শুধু হবে সম্ভব। তখন মনে হবে পদ্মা-যমুনা বা গঙ্গা-জর্ডনও তাই। শুধু ওঝার হাত থেকে বাঁচা নয়, পাঁচ বেলা ওজু আর দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিকের হাত থেকেও রেহাই। ধর্ম নেই, ধর্ম-গ্রন্থ নেই, নেই দেব-দেবী, মহাপুরুষ কিম্বা অবতার কি অপৌরুষের বাণী, নেই ওসবের হুমকি ধমকি তম্বি। থাকবে না তাবিজ মাদুলির বালাই, পূজা-পার্বণের ঘটা, ঘুম তাড়ানো শঙ্খ ঘণ্টার কান-ফাটানো আওয়াজ। এখন ত হজ্বের মতো ধর্ম-কাজ করতে গেলেও লটারির মতো অধর্মের আশ্রয় না নিয়ে উপায় থাকে না। তখন ধর্মের সঙ্গে এ ধরনের সঙ্গে বহু অধর্মেরও ঘটবে অবসান। শাসকেরাও হবেন খুশী; কারণ তখন দেদার বৈদেশিক মুদ্রা যাবে বেঁচে। তবে যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্যকে গদি ছাড়া করে নিজেরা গদিনশিন হতে চায় তারা কিছুটা বেকায়দায় পড়ে যাবে। কারণ তখন ধর্মের হাতুড়ি দিয়ে ক্ষমতার বাদাম কিছুতেই আর ভাঙা যাবে না জনগণের মাথার উপর। তখন সব দেশের সংখ্যালঘুরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, কারণ তখন সাম্প্রদায়িকতা হবে সব দেশ থেকে দেশ-ছাড়া। লৌকিক ঈশ্বরের ব্যাখ্যা নিয়েই ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। স্বয়ং ঈশ্বরই যখন থাকছেন না তখন সম্প্রদায় থাকে কি করে? ধার্মিকেরা অবশ্য সাফাই দিয়ে থাকেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে শয়তানেরই কারসাজি; তা যদি সত্যও হয় তাতেও বাঁচোয়া। কারণ ঈশ্বর না

থাকলে শয়তানও ঝাড়ে-বংশে নির্মূল না হয়ে যায় না। তখন ত নিজেদের অপরাধ কৃতকর্মের শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে রেহাই পাওয়া যাবে না কিছুতেই।

তেমন দিন যদি কখনো আসে, আমার বিশ্বাস পৃথিবীতে তখনই মাত্র মানুষের রাজত্ব তথা মানবতন্ত্র আর মানুষের সভ্যতা দেখা দেবে। এখন ত শুধু কথায় কথায় ঈশ্বরের রাজ্য, ধর্ম-রাজ্য, খোদার রাজ্য, রাম-রাজ্য ইত্যাদি বুলির শাক দিয়ে মাছ ঢাকাই চলছে স্রেফ। তখন এসব বুলির আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। তবে ঈশ্বর আর শয়তানের নামে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তা গড়ে উঠতে যেমন দীর্ঘ সময় লেগেছে তা লোপ পেতেও তেমনি দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তার উপর নতুন করে মানবতন্ত্রী সভ্যতার ভিৎ পত্তনেও ঢের ঢের সময় লেগে যাবে। তার জন্য সবুর করা ছাড়া উপায় নেই।

অবশ্য এও হয়তো অসম্ভব নয় যে প্রথম প্রথম তাতে অনেকেই বেশ অস্বস্তিবোধ করবে, যেমন অনেকে অস্বস্তিবোধ করেছিল ইংরেজ চলে যাওয়ার পর। এমন মানুষ আজো বিরল নয় যারা ইংরেজ রাজত্বের কথা স্মরণ করে আজও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। দাস-প্রথা উচ্ছেদের পর আমেরিকার অনেক নিগ্রোও নাকি আশ্রয় ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। দাসত্ব ওদের মন থেকে সাহসের বীজটুকুও এভাবে নির্মূল করে ছেড়েছিল। আমাদেরও আজ সে একই দশা। বংশানুক্রমে বিশ্বাসের যে ছায়াতলে আমাদের মন-মানস লালিত-পালিত হয়ে গড়ে উঠেছে তার বাইরে পা বাড়াতে শুধু নয়, ভাবতেও আমরা আজ অপারগ। ভাবার জন্য যে সাহসটুকু দরকার তাও যেন আমরা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না!

এমনও হতে পারে ঈশ্বর আর শয়তানহীন মানবতন্ত্রের যুগেও হয়তো এমন মানুষের অভাব হবে না যারা ঈশ্বর আর শয়তানকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাইবে। এজন্য তারা হয়তো তুমুল গণআন্দোলনও গড়ে তুলতে পারে। এমন কি রক্তবিপ্লবের হুমকিও পারে দিতে। উভয়ের সমর্থকরা মিলে শক্তিশালী যুক্তফ্রণ্ট গঠন করাও বিচিত্র নয়। তারা তখন হয়ত রাস্তায় সুদীর্ঘ মিছিল করে 'ঈশ্বর-শয়তান জিন্দাবাদ' 'ঈশ্বর-শয়তান ভাই ভাই' শ্লোগান দিয়ে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতেও চেষ্টার ত্রুটি করবে না। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে তখন বড় বড় পুঁজি-পতিরা এ ধরনের আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার জন্য তলে তলে প্রচুর

অর্থও জোগাতে থাকবে এমনকি পয়সা দিয়ে দাঁড় করাবে বহু দালালও। আর সি. আই. এ. ত ধারে-কাছে রয়েছেই।

তাহলেও মনে হয় সাময়িক বিভ্রান্তির হাত থেকে মানুষ মুক্তি পাবেই। মুক্ত-বুদ্ধি মানুষের স্বাধীন চিন্তার জয়যাত্রা কিছুতেই রোখা যাবে না। কল্পনা কখনো স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে না। আদি মানব-মানবী জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেয়ে মানুষের মনে যে জিজ্ঞাসা আর অসন্তোষের বীজ বপন করে দিয়েছে তার হাত থেকে মানুষের রেহাই নেই। কিন্তু আশ্চর্য দুর্বল মানুষের মন। মৃত্যুকে জয় করার কথায় এখনো মনে তার দ্বিধা জাগে। নিজের চারপাশে অহরহ এত অজস্র মৃত্যু দেখতে হয় যে, মৃত্যুহীন অবস্থা কল্পনা করাও আজ দুঃসাধ্য। মানুষ কোনদিনই মরবে না। চিরজীবী হয়ে থাকবে একথা আজ কিছুতেই ভাবা যায় না। তবে আশার কথা এটুকু আজ যা ভাবা যায় না বা যায়নি, এমন অনেক কিছুই ত কালে কালে বাস্তবে রূপ নিয়েছে। একদিন যা কল্পনারও অতীত ছিল আজ তার অনেক কিছুই মানুষের আয়ত্তে এসে গেছে। মৃত্যুর বেলায়ও তা সত্য হবে কি ? পুরপুরি না হোক আংশিক সত্য হলেও ঈশ্বর আর শয়তানের প্রচলিত ধারণায় বদল ঘটবে।

আণবিক বোমা আবিষ্কারের আগে সামান্য অণুর মধ্যে যে এত অসীম শক্তি সুপ্ত রয়েছে তা কে জানতো ? যে অণু-তুল্য জীবকোষ দিয়ে মানব-দেহ গঠিত তার ক্ষয় নিবারণ করতে পারলে, অন্তত বিলম্বিত করতে পারলে মানুষের আয়ু-সীমা নিশ্চয়ই অনেক বেড়ে যাবে। এক নাগাড়ে দু' তিন শ' বছর বাঁচার পর মানুষের নিজেরই হয়ত আর তখন বাঁচতে ইচ্ছা হবে না। কাজেই তেমন অবস্থায় মৃত্যু-ভয়ও স্বভাবতই কমে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক ঈশ্বর আর শয়তানভীতিও পাবে লোপ। ফলে পরকালের ধারণাও যাবে পাল্টে। এখনকার মত তখন আর কেউ ঈশ্বর, শয়তান, গোর–আজাব ইত্যাদির ভয়ে মরার আগে মরবে না। আর অতকাল ধরে জীবনটাকে ইচ্ছামত ভোগ করার পর পরপারে বা পরকালে কি হবে না হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন দু'চার জন অতি লোভী পুণ্যবান আর অতি পাপী ছাড়া আর কেউই হয়তো বোধ করবে না। এ বোধ না করলেই ত ঈশ্বর আর শয়তানের যুগপৎ যুগল সহমরণ। সঙ্গে সঙ্গে এ দুই মূলধন আজ যাদের একমাত্র পুঁজি তাদের পেশারও তখন ভরাডুবি। আমার বিশ্বাস একমাত্র তখনই হবে

নির্ভেজাল মানবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমি এ আলোচনায় মানুষের ধ্যান-ধারণা আর বিশ্বাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত এমন একটি বিষয়ে পাঠকের মনকে একটুখানি নাড়া দিতে চেয়েছি শুধু। পাঠকও জিজ্ঞাসু হয়ে উঠুক আর সে জিজ্ঞাসা কোন একটা চীনের প্রাচীরে এসে আটকা না না পড়ুক এ আমার ইচ্ছা। অত্যন্ত আশার কথা কিছুদিন আগে আমার বক্তব্যের অনুকূল একটি চমকপ্রদ সংবাদ লণ্ডন থেকে পরিবেশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য লণ্ডন আজও বিশ্বের সংস্কৃতি-কেন্দ্র। তাই সংবাদটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ধর্মীয় ব্যাপারেও মানুষের ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস যে নতুন পথে মোড় নিচ্ছে এ তারই যেন শুভ সূচনা। ধর্মের খুঁটি-নাটি ব্যাপারেও এত কাল যাঁরা গোঁড়া রক্ষণশীলের ভূমিকায় অভিনয় করে এসেছেন আজ তাঁদের মনেও দেখা দিয়েছে ফাটল। বিজ্ঞান আর নতুন জীবন-চেতনার শক্তি এমনি অমোঘ আর এমনি দুর্বার! সংবাদটি এই :

"London Jan. 19 (1961)—All mention of the devil is to be dropped from the new catechism of the church of England, adds A. F. P. A revised version of the catechism modernizing some of the earlier phraseology notably omits the phrase : "I renounce the devil and all his works." The new wording was approved last night at a Synod of Anglican clergy here but not without some criticism of the omission.

এমন দিন হয়তো বেশী দূরে নয় যখন শয়তানের নাম না নিতে নিতে শয়তানের অস্তিত্বই মানুষ ভুলে যাবে। তখন এতদিন ধরে শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ অহরহ যাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করে এসেছে তাঁর সম্বন্ধে ধারণায়ও কি খানিকটা রদবদল ঘটবে না ?

আশ্চর্য, আমি যে বলেছি শয়তান না থাকলেও শয়তানের সমর্থকের কিন্তু অভাব হবে না, আমার সে কথারও সমর্থন রয়েছে উদ্ধৃত সংবাদটিতে (Not without criticism কথাটা লক্ষ্য করার মতো !)।

মানব-কল্যাণ

মানব-কল্যাণ—এ শিরোনাম আমার দেওয়া নয়। আমাদের প্রচলিত ধারণা আর চলতি কথায় মানব-কল্যাণ কথাটা অনেকখানি সস্তা আর মামুলি অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকেও আমরা মানব-কল্যাণ মনে করে থাকি। মনুষ্যত্ববোধ আর মানব-মর্যাদাকে এতে যে ক্ষুণ্ন করা হয় তা সাধারণতঃ উপলব্ধি করা হয় না।

ইসলামের নবী বলেছেন: উপরের হাত সব সময় নীচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ'। নীচের হাত মানে যে মানুষ হাত পেতে গ্রহণ করে, উপরের হাত মানে দাতা, যে, হাত তুলে উপর থেকে অনুগ্রহ বর্ষণ করে। দান বা ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা তার সর্ব অবয়বে কিভাবে প্রতিফলিত হয় তার বীভৎস দৃশ্য কার না নজরে পড়েছে?

মনুষ্যত্ব আর মানব-মর্যাদার দিক থেকে অনুগ্রহকারী আর অনুগৃহীতের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। এ ব্যক্তির বেলায় যেমন সত্য, তেমনি দেশ আর রাষ্ট্রের বেলায় বরং অধিকতর সত্য। কারণ রাষ্ট্র জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনারই প্রতীক।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু প্রশাসন চালানোই নয়, জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলাও রাষ্ট্রের এক বৃহত্তর দায়িত্ব। যে রাষ্ট্র হাতপাতা আর চাটুকারিতাকে দেয় প্রশ্রয়, সে রাষ্ট্র কিছুতেই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে পারে না।

তাই মানব-কল্যাণ অর্থে আমি দয়া বা করুণার বশবর্তী হয়ে দান-খয়রাতকে মনে করি না। মনুষ্যত্বের অবমাননা যে ক্রিয়াকর্মের অবশ্যম্ভাবী

পরিণতি তাকে কিছুতেই মানব-কল্যাণ নামে অভিহিত করা যায় না। মানব-কল্যাণের উৎস—মানুষের মর্যাদাবোধবৃদ্ধি আর মানবিক চেতনা বিকাশের মধ্যেই নিহিত। একদিন এক ব্যক্তি ইসলামের নবীর কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিলো, নবী তাকে একখানা কুড়াল কিনে দিয়ে বলেছিলেন এটি দিয়ে তুমি বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা রোজগার করোগে। এভাবে তিনি লোকটিকে শুধু স্বাবলম্বনের পথ দেখাননি, সে সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মর্যাদাবান হওয়ার, মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের উপায়ও।

মানুষকে মানুষ হিসেবে এবং মানবিক বৃত্তির বিকাশের পথেই বেড়ে উঠতে হবে আর তার যথাযথ ক্ষেত্ররচনাই মানব-কল্যাণের প্রাথমিক সোপান। সে সোপান রচনাই সমাজ আর রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সমাজের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ বা ইউনিট পরিবার—সে পরিবারকেও পালন করতে হয় এ দায়িত্ব। কারণ মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা সেখান থেকেই। ধীরে ধীরে ব্যাপকতর পরিধিতে যখন মানুষের বিচরণ হয় শুরু, তখন সে পরিধিতে যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে—তা শিক্ষা কিংবা জীবিকা সংক্রান্ত যা হোক না তখন সে দায়িত্ব ঐ সব প্রতিষ্ঠানের উপরও বর্তায়। তবে তা অনেকখানি নির্ভর করে অনুকূল পরিবেশ ও ক্ষেত্র গড়ে তোলার উপর। যাঁরা আজকের এ আলোচ্য বিষয়টি নির্বাচন করেছেন, মানব-কল্যাণ অর্থে তাঁরা কি মনে করেছেন তা আমি জানিনা। আমি যা মনে করি, সেইটুকুই শুধু আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করলাম। মানব-কল্যাণ স্বয়ম্ভূ, বিচ্ছিন্ন, সম্পর্ক-রহিত হতে পারে না। প্রতিটি মানুষ যেমন সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনি তার কল্যাণও সামগ্রিকভাবে সমাজের ভালো-মন্দের সঙ্গে সংযুক্ত। এ উপলব্ধি ছাড়া মানব-কল্যাণ স্রেফ দান-খয়রাত আর কাঙ্গালী ভোজনের মতো মানব-মর্যাদার অবমাননাকর এক পদ্ধতি না হয়ে যায় না, যা আমাদের দেশ আর সমাজে হয়েছে। এ সবকে বাহবা দেওয়ার এবং এ সব করে বাহবা কুড়োবার লোকেরও অভাব নেই দেশে।

আসল কথা মানুষের মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে স্রেফ তার জৈব অস্তিত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল এ ধরনের মানব-কল্যাণ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হতে পারে না। এ হেন মানব-কল্যাণের কুৎসিত ছবি দেখার জন্য দূরদূরান্তে

যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদের আশে পাশে, চারদিকে তাকিয়ে দেখলেই তা দেখা যায়।

বর্তমানে মানব-কল্যাণ অর্থে আমরা যা বুঝি তার প্রধানতম অন্তরায় রাষ্ট্র, জাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত চেতনা---যা মানুষকে মেলায় না, করে বিভক্ত। বিভক্তিকরণের মনোভাব নিয়ে কারো কল্যাণ করা যায় না। করা যায়---একমাত্র সমতা আর সহযোগ সহযোগিতার পথে।
সত্যিকার মানব কল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনারই ফসল। বাংলাদেশের মহৎ প্রতিভারা সবাই মানবিক চিন্তা আর আদর্শের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। দুঃখের বিষয় সে উত্তরাধিকারকে আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারিনি।।

বিদ্যপতি চণ্ডীদাস থেকে লালন প্রভৃতি লোক-কবিরা এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ নজরুল সবাইত মানবিক চেতনার উদাত্ত কণ্ঠস্বর। বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক উক্তি: ‘তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?’ এক গভীর মূল্যবোধেরই উৎসারণ।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত উক্তিটিও স্মরণীয়: “Relationship is the fundamental truth of the world of appearence”, কবি এ উক্তি করেছিলেন তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায়। অন্তর জগতের বাইরে যে জগৎকে আমরা অহরহ দেখতে পাই তার মৌলিক সত্য পারস্পরিক সংযোগ-সহযোগিতা, কবি যাকে Relationship বলেছেন। সে সংযোগ বা সম্পর্কের অভাব ঘটলে মানব-কল্যাণ কথাটা স্রেফ ভিক্ষা দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কে পরিণত হয়। অনেকে হয়তো শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর “The creation of Man” ছবিটির প্রতিলিপি দেখেছেন---অতি সরল স্পষ্ট একখানা ছবি---দু'দিক থেকে দু'টি মানুষের হাত আঙুল বাড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে চাচ্ছে। মানব-সৃষ্টির মূল কথাটাই শিল্পী এ ছবির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই ছবিটির নাম দিয়েছেন তিনি ‘The creation of Man”। কি এক অদ্ভুত সংকেতবহ ছবি! এ ছবিটিরই প্রতিলিপি ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর “The Religion of Man” বইটির প্রচ্ছদ হিসেবে।

যেহেতু রাষ্ট্র আজ সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী, অধিকন্তু যে ধরনের

রাজনীতি রাষ্ট্রের পেছনে সক্রিয় তাও এত সর্বব্যাপক যে তা যদি মানবিক দৃষ্টিসম্পন্ন না হয় তা হলে মানব-কল্যাণ অর্থে আমরা যা বুঝি তা এ পরিস্থিতিতে মোটেও বাধা-মুক্ত হতে পারে না। এবং তার বাস্তবায়ন একরকম অসম্ভব বল্লেই চলে।

আমরা আজ এক চরম স্ববিরোধিতার যুগে বাস করছি। একদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি, যা মানব মনীষা, সাধনা আর প্রতিভারই ফলশ্রুতি। অন্যদিকে মানবতার চরম লাঞ্ছনা আর নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। এবং সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় জীবনে এ সব দিন দিনই বেড়ে চলেছে দ্রুত গতিতে।

বলা বাহুল্য মানব-কল্যাণ বিচ্ছিন্ন কিংবা খণ্ডিত কোন ব্যাপার নয়। গুটি কয়েক ভিখিরি বিদায় কিংবা কিছু সংখ্যক অভাবগ্রস্তের অভাবমোচন মানবিক সমস্যার দিক দিয়ে স্রেফ ছেঁড়া কাপড়ে তালি দেওয়া।

অধিকন্তু আমাদের দেশে, হয়তো অন্যত্রও এ ধরনের মানব-কল্যাণকে পারলৌকিক মুক্তির উপায় হিসেবেও গণ্য করা হয়। মনে করা হয় পারলৌকিক ফল লাভের এ এক মোক্ষম উপায়। ফলে ভিক্ষুক আর ভিক্ষাদাতার সম্পর্কে দেখা যায় না কিছুমাত্র মানবিকতার লক্ষণ। খুঁজে পাওয়া যায় না মানবিকসম্পর্ক তথা Human Relationship-এর ছোঁয়া।

বিশ্বাস আর ব্যবহারিক জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। মানব-কল্যাণ অর্থে আমি পুরোপুরি ব্যবহারিক জীবনের কল্যাণকে বুঝাতে চাচ্ছি। জীবন— যে জীবন আমরা প্রতিদিন যাপন করে থাকি তা সম্পূর্ণভাবে ইহলৌকিক। ইহলৌকিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পারলৌকিকের সংযোগ ঘটালে কোনটারই অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার কথা নয়। শেষোক্ত জীবন অজানা ও অদৃশ্য এবং সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস-নির্ভর। প্রথমটা অর্থাৎ জাগতিক জীবন চক্ষুগ্রাহ্য', আমাদের প্রতি মুহূর্তের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং আমাদের অভিজ্ঞতার অঙ্গীভূত। মানব কল্যাণ পুরোপুরি এ জীবনেরই অঙ্গ এবং এজীবনের সঙ্গেই তার সম্পর্ক। একে পরলোকের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সংযুক্ত করে বিচার করতে গেলে কল্যাণ কথাটা অর্থহীন হয়ে পড়ে।

কারণ পারলৌকিক কল্যাণ-অকল্যাণ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং তা আমাদের সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা বহির্ভূত বলে তার মূল্যায়ন আমাদের পক্ষে অসাধ্য।

তাই আমাদের সব কল্যাণ-কর্মকে জাগতিক জীবনের ভালো মন্দের নিরিখে বিচার করতে হবে। যা জীবনের বাইরের ব্যাপার তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তার সাধন ও সাধনার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিক। জাগতিক জীবন ও তার কল্যাণ-অকল্যাণ তেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। তার ধরণ-ধারণ ও করণীয় ভিন্ন। মৃত আর জীবিতের মধ্যে যে তফাত এ অনেকটা তাই।

কল্যাণ-কর্ম সম্বন্ধে আমাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা বা Conception রয়েছে যার ফলে আমরা সব রকম কল্যাণ-কর্মকে পারলৌকিক লাভালাভের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিই এবং সে লক্ষ্যটা সামনে রেখেই সাধারণ দান-খয়রাত থেকে স্কুল-মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিকে নিয়েও দেখে থাকি। ফলে এতে অনেক সময় মানবিক মর্যাদা হয় বিসর্জিত।

মানব-কল্যাণ অলৌকিক কিছু নয়---এ এক জাগতিক মানবধর্ম। তাই এর সাথে মানব-মর্যাদার তথা Human dignity'র সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আজ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলে কি দেখতে পাই? দেখতে পাই দুঃস্থ, অবহেলিত, বাস্তহারা, স্বদেশ-বিতাড়িত মানুষের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। সে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে রিলিফ, রিহেবিলিটেশন ইত্যাদি শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ। রেডক্রস ইত্যাদি সেবাধর্মী সংস্থার সংখ্যাবৃদ্ধিই কি প্রমাণ করে না মানব-কল্যাণ কথাটা স্রেফ মানব-অপমানে পরিণত হয়েছে? মানুষের স্বাভাবিক অধিকার আর মর্যাদার স্বীকৃতি আর প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানব-কল্যাণ মানব-অপমানে পরিণত না হয়ে পারে না। এখন যা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে মানুষ আর তার সামাজিক সত্তাকে স্বীকার করে কল্যাণ-কর্মের, সে সঙ্গে সর্বমানুষের নিরাপত্তার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা না হলে, রেডক্রসই বলুন, রোটারি-লায়ন্সই বলুন, সবই তো ছেঁড়া কাপড়ে তালি দেওয়া মাত্র। এতে সমস্যার যেমন সমাধান হয় না, তেমনি ঘুচে না মানুষের অপমানও।

মানুষ সমাজিক জীব, বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, তাই তার কল্যাণও বিচ্ছিন্ন নয়, নয় সমাজ সম্পর্কহীন। মানুষের স্বাস্থ্য যেমন তার সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনি মানব-কল্যাণকেও হতে হবে সামগ্রিক, সর্বমানবিক। তার ভিত্তিভূমি মানুষ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-উক্তি আরো সুস্পষ্ট: We can never go beyond Man to all that we know and feel. এ জানা আর অনুভূতির উপরই নির্ভর করে মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ সাধন। অন্যত্র কবির উক্তি আরো দৃপ্ত : The God of humanity has arrived at the gates of the ruined temple of the tribe.

কালের বিবর্তনে আমরা এখন আর tribe বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীব নই—বৃহত্তর মানবতার অংশ। তাই God of huminity-কে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কিংবা খণ্ডিতভাবে দেখা বা নেওয়া যায় না। তেমনি নেওয়া যায় না তার কল্যাণকর্মকেও খণ্ডিত করে। দেখতে মানুষও অন্য একটা প্রাণী মাত্র কিন্তু ভিতরে মানুষের মধ্যে রয়েছে এক অসীম ও অনন্ত সম্ভাবনার বীজ। যে সম্ভাবনার স্ফুরণ-স্ফুটনের সুযোগ দেওয়া, ক্ষেত্র রচনা আর তাতে সাহায্য করাই শ্রেষ্ঠতম মানব-কল্যাণ। সেটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কিংবা কোন রকম অপমান-অবমাননার পথে হতে পারে না। হালে যে দর্শনকে অস্তিত্ববাদ নামে অভিহিত করা হয়, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Existentialism তারও মূল কথা ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দান। সব রকম অন্যায় আর মনুষ্যত্বের অবমাননার সামনে যে মাথা তুলে বলতে পারে,---না, No। এ দর্শনের মূল কথা। I can say No ; Therefore I exist। কিন্তু একজন ভিখিরি বা অনুগ্রহপ্রার্থী ত তেমন কথা বলতে পারে না। বলতে পারে না আমি নেব না, আমি মানবো না, করবো না মাথা নত। ফলে তেমন মানুষ পারে না নিজের মনুষ্যত্ব আর মানব-মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে। ভিখিরি আর অনুগৃহীতকে সব সময় কিল খেয়ে কিল হজম করতে হয়। চরম অপমানের মুহূর্তেও মুখে ফুটিয়ে তুলতে হয় হাসি। শওকত ওসমান সীমিত সাফল্যের সাথে এ দুঃসহ অবস্থার এক সকরুণ চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর 'ক্রীতদাসের হাসি'তে।

বল প্রয়োগ কিবা সামরিক শাসন দিয়ে মানুষকে তাঁবেদার কিংবা চাটুকার বানাতে পারা যায় কিন্তু প্রতিষ্ঠা করা যায় না মানব মর্যাদার আসনে।

সবকর্মের সাথে শুধু যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে তা নয়, তার সামাজিক পরিণতি তথা social consequence-ও অবিচ্ছিন্ন। যেহেতু সব মানুষই সমাজের অঙ্গ, তাই সব রকম কল্যাণ-কর্মের ও রয়েছে সামাজিক পরিণতি। এ সত্যটা অনেক সময় ভুলে থাকা হয়। বিশেষত যখন দৃষ্টি থাকে উর্ধ্ব দিকে তথা পরলোকের পানে।

স্রেফ সদিচ্ছার দ্বারা মানব-কল্যাণ সাধিত হয় না। সব ধর্ম আর ধর্ম-প্রবর্তকেরা বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের ভালো করো, মানুষের কল্যাণ করো, সুখ শান্তি দান করো মানুষকে। এমন কি সর্বজীবে হিতের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখতে পাই?

ইসলামের শব্দগত অর্থ 'শান্তি'। ইসলাম প্রচার করে সাম্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু মুসলমান বা ইসলামী রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই এর বিপরীত দৃশ্য। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিক জীবনেও এ বৈপরীত্য কম লক্ষ্যগোচর নয়।

মানব-প্রেম প্রচারে খ্রীস্ট ধর্ম আরো সোচ্চার: খ্রীস্টের এক সুবিখ্যাত নির্দেশ: কেউ তোমার এক গালে চড় দিলে অন্য গাল পেতে দাও। প্রেম ও অহিংসার এ যে এক পরম অভিব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। অথচ দু'দু'টা বিশ্বযুদ্ধ খ্রীস্টানে খ্রীস্টানেই হয়েছে এবং ব্যবহার করেছে সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র একে অপরের বিরুদ্ধে। যা শুধু অসংখ্য মৃত্যুর কারণ হয়নি, ততোধিক মানুষকে করেছে পঙ্গু। যে পঙ্গুতা কোন কোন ক্ষেত্রে রূপ নিয়েছে বংশানুক্রমিক পরিণতিতে। অধিকতর শক্তিশালী মারণাস্ত্র নির্মাণ কি কিছুমাত্র হ্রাস পেয়েছে ঐ সব সর্বাধিক উন্নত দেশে?

অহিংসার প্রতিমূর্তি মহামানব বুদ্ধের এক স্মরণীয় উক্তি: সকল প্রাণী সুখী হোক। কিন্তু অন্যান্য মহাপুরুষদের শিক্ষা ও নির্দেশের মতো এও ত শুধু এক আশার বাণী, প্রার্থনা বাক্য মাত্র। পরিণামে দেখা যায় সব ধর্ম উপদেশই যাকে বলে pious wish তাতেই নিঃশেষিত হয়।

এ সবের ফলে মানব জাতির ভাগ্যে সুখ নেমে আসেনি। সব ধর্ম-গুরু আর মহাপুরুষেরা এরকম অজস্র প্রার্থনা-বাণী রেখে গেছেন। কিন্তু সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা ক্রমাগতই মানুষের জীবন থেকে দূরে সরে গেছে,

সরে যাচ্ছে প্রতিদিন। চীন-জাপান ভিয়েৎনাম কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ ঐতিহাসিকভাবে মহাপুরুষ বুদ্ধের অনুগামী। মানব-কল্যাণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় কোথাও একটা গলদ রয়েছে, তাই এত সব উন্নতি সত্ত্বেও আমরা কল্যাণের অভীষ্ট লক্ষ্যে পেঁৗছতে পারিনি। পারছি না।

অতএব আমাদের দৃষ্টিভংগী পাল্টাতে হবে। সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। নতুন পদ্ধতিতে—যা হবে বৈজ্ঞানিক, র‍্যাশেনাল ও সুবুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত। সমস্যা যত বড় আর যত ব্যাপকই হোক না তার মোকাবেলা করতে হবে সাহস আর বুদ্ধিমত্তার সাথে। এড়িয়ে গিয়ে কিংবা জোড়াতালি দিয়ে কোন সমস্যারই সমাধান করা যায় না।

এযুগের মানবতাবাদী দার্শনিক বিজ্ঞানী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথা দিয়ে আমি আমার বক্তব্যের সমাপ্তি টানছিঃ We want to stand upon our own feet and look fair and square at the world—its good facts, its bad facts, its beauties and its ugliness, see the world as it is and be not afraid of it.

* * * * * *

It needs a fearless outlook and free intelligence. It needs hope for the future, not looking back all the time toward a past that is dead, which we trust will be far surpassed by the future that our intelligence can create. দীর্ঘকাল ধরে আমরা মুক্তবুদ্ধির কথা, রাসেল যাকে Free intilligence বলেছেন, তা আমাদের সীমিত সুযোগ আর শক্তি দিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি–এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে থেকেই। আমাদের বিশ্বাস মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় সুপরিকল্পিত পথেই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব। একমাত্র মুক্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বংসের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে করা যায় নিয়োগ। তা করা হলেই মানব-কল্যাণ হয়ে উঠবে মানব-মর্যাদার সহায়ক॥